KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৮/১২৮ (পরে ১১৭৮৮৮১, ফোন-৪৫
Collection : KLMLGK	Publisher : কিরণির ঘুঁঘুরি
Title : অন্যদিন (ANYADIN)	Size : 8.5"/5.5"
Vol & Number : 18-19 21 22 23	Year of Publication : ১৩৮১ Dec - March 74-75 ১৩৮২ ১৩৮২ Jan - March 1976
	Condition : Brittle Good
Editor : কিরণির ঘুঁঘুরি	Remarks :

C.D. Rod No : KLMLGK

কবিতা কেন্দ্রিক ত্রৈমাসিক

অন্যদিন

সম্পাদক
শিশির ভট্টাচার্য

প্রথম সংখ্যা ১৩৮৩ ● শ্রেষ্ঠতম সংকলন

UBI

হিল স্টেশনে ঘুরে আসার খরচে বিদেশে ছুটি কাটিয়ে আসুন!

মরিশাস

বিদেশে ছুটি কাটানো, আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে গেছে। ভারতের কোনো ভালো হিল স্টেশনে ছুটি কাটানোর চেয়ে তাতে সত্যিই খরচ অনেক কম।

আপনার স্বপ্নেভরা ছুটির দিনগুলো মরিশাস এক স্বর্গদ্বীপ—বড় বড় ফুল আর অপূর্ব ঝরনায় ভরা। আর সেই সঙ্গে সহজ আড়ম্বরহীন জীবন। এখানে পাবেন পৃথিবীর কিছু সেরা সাগরতট, যেখানে সূর্যস্নান, সাঁতার আর বিকিনি পরা সুন্দরীদের ভীড়!

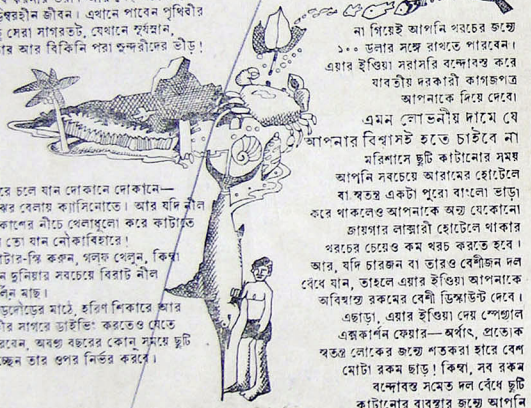

দুপুরে চলে যান দোকানে দোকানে—সাঁঝের বেলায় ক্যাসিনোতে। আর যদি নীল আকাশের নীচে খেলাধুলো করে কাটাতে চান তো যান নৌকাবিহারে!

ওয়াটার-স্কি করুন, গলফ খেলুন, কিম্বা ধরুন দুনিয়ার সবচেয়ে বিরাট নীল মার্লিন মাছ।

ঘোড়দৌড়ের মাঠে, হরিণ শিকারে আর গভীর সাগরে ডাইভিং করতেও যেতে পারবেন, অবশ্য বছরের কোন্ সময়ে ছুটি নিচ্ছেন তার ওপর নির্ভর করবে।

রীতিনীতির ঝঞ্ঝাট সবচেয়ে কম

গত তিন বছর ধরে আপনি বিদেশে কাটিয়ে থাকলেও মরিশাসে যাবার জন্যে আপনার পি ফর্ম লাগবে না। আপনার পাসপোর্ট এণ্ডর্সমেন্ট বা ভিসারও দরকার হবে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কে

না গিয়েই আপনি খরচের জন্যে ১০০ ডলার সঙ্গে রাখতে পারবেন। এয়ার ইণ্ডিয়া সরাসরি বন্দোবস্ত করে যাবতীয় দরকারী কাগজপত্র আপনাকে দিয়ে দেবে।

এমন লোভনীয় দামে যে

আপনার বিশ্বাসই হতে চাইবে না

মরিশাসে ছুটি কাটানোর সময় আপনি সবচেয়ে আরামের হোটেলে বা স্বতন্ত্র একটা পুরো বাংলো ভাড়া করে থাকলেও আপনাকে অন্য যেকোনো জায়গার লাক্সারী হোটেলে থাকার খরচের চেয়েও কম খরচ করতে হবে। আর, যদি চারজন বা তারও বেশীজন দল বেঁধে যান, তাহলে এয়ার ইণ্ডিয়া আপনাকে অবিশ্বাস্য রকমের বেশী ডিস্কাউন্ট দেবে। এছাড়া, এয়ার ইণ্ডিয়া দেয় স্পেশ্যাল এক্সকার্শন ফেয়ার—অর্থাৎ, প্রত্যেক স্বতন্ত্র লোকের জন্যে শতকরা হারে বেশ মোটা রকম ছাড়! কিম্বা, সব রকম বন্দোবস্ত সমেত দল বেঁধে ছুটি কাটানোর ব্যবস্থার জন্যে আপনি আপনার ট্রাভেল্ এজেন্টকেও বলতে পারেন।

এয়ার-ইণ্ডিয়া

সপ্তাহে দুবার
সোজা মরিশাস

AI-9641 (A)

15th page - AIR India
22nd Page - Family Planning

অন্যদিন

অবৈতনিক সম্পাদক ঃ শিশির ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ জীবন সরকার

অন্যদিন প্রধানত তরুণ গোষ্ঠীর ত্রৈমাসিক কবিতাকেন্দ্রিক মুখপত্র। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক জীবনধর্মী গল্প, কবিতা ও আলোচনা সাদরে গৃহীত হবে। চিঠির উত্তর পেতে হলে অনুগ্রহ করে ডাকটিকিটযুক্ত নাম ঠিকানা লেখা খাম পাঠাবেন।

●

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস, ক'লকাতা-৪৫ ফোন ৪৬-৩৭১৪।

●

সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, ক'লকাতা-৬ থেকে হরিপদ পাত্র কর্তৃক মুদ্রিত ও শিশির ভট্টাচার্য কর্তৃক ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস ক'লকাতা-৪৫ থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদশিল্পী ঃ কমল সাহা, প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ইম্প্রেশন হাউস ঃ ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, ক'লকাতা-৯

●

দাম : দেড় টাকা

গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৩৮৩
তৃতীয় সংকলন

অন্যদিন

প্রবন্ধ

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

গল্প

তুষারাভ রায়চৌধুরী
অতীন্দ্রিয় পাঠক

কবিতা

অরবিন্দ ভট্টাচার্য * অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় * অরুণাভ ভৌমিক * ইন্দ্রজিৎ বসু * উদয়ন ভৌমিক * কবিতা সিংহ * গোপাল ভৌমিক * চিত্রভানু সরকার * জমিল সৈয়দ * তরুণ চক্রবর্তী * দীপক কর * নির্মল বসাক * নীরদ রায় * পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত * প্রসূন মিত্র * বরুণ মণ্ডল * মঞ্জুভাষ মিত্র * মোহন মিত্র * রতন বিশ্বাস * শশধর রায় * শিতিকেশ মুখোপাধ্যায় * শ্যামল রায়চৌধুরী * সালাহউদ্দিন চৌধুরী * সুকুমাররঞ্জন ঘোষ * শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায় * হিমাংশু জানা * শিশির ভট্টাচার্য।

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

দীর্ঘ কবিতায় কবির ভাবনা ও প্রস্তাবনা

॥ তিন ॥

সীমার বন্ধনকে অসীমের আলিঙ্গনে মিলিয়ে দিতে ব্রুটাসের মতো নির্মম হৃদয়ের মানুষকেও উপনীত হোতে দেখা গেল এক বাঙ্ময় মহানীরবতার সীমান্তে—অর্থাৎ ; কবিতার আয়তনগত দীর্ঘ ভাবনায় আবার ক্লিওপেট্রার সম্মতিব্যঞ্জক উচ্চারণের মধ্যে আমরা শুনতে পেলাম ঃ 'I am five and air. my other elements I give to baser life ঃ—এই নত নীরবতার কথা কিংবা, হৃদয় যখন চেতনঅবচেতনের নিশীথ অন্ধকারে চলতে চলতে বিশ্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ অতিক্রম করে পৌঁছে যায় উদ্দিষ্টের মুখপানে, যেখানে সেই ক্লান্তপ্রাণ মানুষের বিশুদ্ধ চৈতন্য স্থিতধী হোতে দেখা যায় সময় প্রহত ক্লান্তি ও আশ্বাসময়তার নতজানু নৈবেদ্যের কাছে ঃ 'পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন/তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল/সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী……' কিংবা ; 'পাতী অরণ্যে কার পদপাত শুনি ?/জানি কোনও দিন ফিরবে না ফাল্গুনী ঃ/ তবে অঞ্জলি উদ্যত কেন পলাশে ?/বনের বাহিরে ক্ষওয়া মাটি ধূ ধূ করে :/ নেই ফসলের দুরাশাও অম্বরে : যা ছিল বলার, কবে হয়ে গেছে বলা সে ॥ কাব্যচিন্তায় শব্দের পর শব্দের ব্যবহার স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার মাধ্যম হোয়ে 'Social attitude and artistic representation of reality'র ভাবনাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলে—আবার শব্দের পর শব্দের নিবিড় সংযোগময়তা চিত্রকল্প তৈরীর মনস্কতা অপেক্ষা চিত্রের বর্ণন উদ্দীপক ব্যঞ্জনাকে অধিকতর ক্রিয়াশীল করে তোলে, যেমন ঃ কালিমাখা মেঘ ওপারে আঁধার ঘনিয়েছে দেখ চাহি রে', অথবা ঃ 'হেমন্ত নিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার শাদা মরা শেফালীর বিছানার পর'।

জীবন, প্রকৃতি ও অন্যান্য ভাবনা 'না বলা বাণীর' আভাসে অনুভূতিকে কখনো দ্বন্দ্ব-ক্লান্তির ব্যাপকতায় অভিজ্ঞতাকে জাগ্রত করে জীবনের ব্যর্থতা-বেদনায় আশা-আকাঙ্ক্ষার মুকুলিত স্বপ্নে কবিতার দীর্ঘ আয়তনে দূরবর্তী হোতে হোতে।

পরিমিত আয়তনের সীমাকে ভেঙে ফেলে ভাবনার বিস্তৃত ব্যাপকতা কবিতার ভাবনাকে কখনো দীর্ঘ করেছে বাক্‌প্রতিমার উজ্জ্বল উপস্থাপনায়, কখনো চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনায়। মুহূর্তের ভাব, ভাব-কল্পকে আশ্রয় করে শব্দ, শব্দব্যঞ্জনা অনুভূতি প্রকাশের পথকে নিবিড় রূপময় করে তোলে।

কবিতায় বিশেষ করে দীর্ঘ আয়তনের বয়নে 'শব্দ' কবিকে অমিত প্রয়োগের চেতনায় শৃংখল ভেঙে ফেলে ভাবনার ক্রমোন্মুক্তিকে তরান্বিত করে মথিত বেদনাকে আবেগদীপ্ত করতে, ফলে এইসব কবিতার সম্ভব 'শব্দ' প্রয়োগের নৈপুণ্যে শ্লীল-অশ্লীলতার ভাবনা অতিক্রম করে এক বিস্তৃত পরিবেশে নষ্ট সৌন্দর্যকে মূর্ত করে তোলে। যেখানে শব্দের সাদা-মাঠা ব্যবহারে অনুভূত শ্লীল-অশ্লীলতার প্রচার প্রয়োগ; এমন কি 'ভদ্র সমাজের অনুচ্চার্য' শব্দ কাব্যিক শব্দ সম্পদের দ্যোতনায় উজ্জ্বল মনে হয়ঃ 'আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এপারে।/বিয়োবার দেরি নাই—রূপ ঝরে পড়ে তার—শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে'—কবিতার দীর্ঘ আয়তনের ব্যাপ্ততে এইভাবেই শব্দ-শব্দ চেতনা এই সময়ের অস্থির উত্তেজনা, মানসিক সংশয়োদ্বেল চিত্তের দ্বিধা-দীর্ণ মনোভাব, প্রেম-অপ্রেম, তৃপ্তি-অতৃপ্তির চূড়ান্তবোধকে পূর্ণায়ত করে।

কবিতার দীর্ঘ চালচিত্রে কোনো বিশেষ 'শব্দ' 'শব্দ' সম্পর্কিত চেতনা সাধারণ ব্যবহারিক অর্থে শুধুমাত্র প্রযুক্ত না হোয়ে এর প্রয়োগ নৈপুণ্যের আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকে সময়ের অস্থির মনস্কতা সম্বন্ধীয় বিষয় ভাবনা, আঞ্চলিকতার স্বাদ-গন্ধে ভরা ঘরোয়া জীবনের বর্ণমালা, জীবনের শূন্যতা সম্পৃক্ত অনুভব, যুগোপম চিন্তা-চেতনার জিজ্ঞাসা; যে কল্পিত জিজ্ঞাসার অবয়ন, অর্থাৎ 'With beauty like a tightened low', কিংবা From dream to dream and rhyme to rhyme I have rauged/In rambling talk with an image of air :/vague menories, nothing but menories.' কিংবা; 'জ্যোতির্গামী কিন্তু সেই তমসত্ত/তারার ফেনা উৎসারিত ক্রমশঃ/মৌনে পড়ে তীর্থামতে লোমশত্ত/স্বয়ংবর

প্রমা। শব্দের পারস্পরিক মিলন-ব্যবহারে যুগের ভাবনা—চিন্তা-চেতনার ব্যাপকচিত্র অনন্যবোধে উজ্জ্বল হোয়ে ওঠে; এই প্রয়োগ ও ব্যবহারের সীমান্তে এসে এইসব শব্দ শব্দকল্প শুধুমাত্র শব্দগত ব্যঞ্জনা নিয়েই উপস্থিত থাকে না; এইসব বিশেষ শব্দ, শব্দ সম্পর্কিত মোহ, ভালোবাসা, রহস্যময় অনুভূতি প্রাথমিক অর্থে প্রিয় হোলেও কোনো কারণেই শিল্পীর সাধারণ অর্থে প্রিয় নয়—এই বিশেষ শব্দ, বিশেষ বাক্য ও চিত্রকল্পের পুনর্ব্যবহারে কবি মানসিক স্বস্তি ও প্রিয়সুখ অনুভব করেন এবং পৌঁছে যান ভাবনার শেষতম চূড়ায় অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যে।

আয়তনে সীমিত কবিতার বর্ণন উদ্দীপক ব্যঞ্জনা, কিংবা এর চিত্রল প্রয়োগের নৈপুণ্য ও দীপ্তিমুখর স্খলিত চরণমালা আমাদের মুগ্ধ আবেগকে বিদ্ধ করতে সক্ষম হোলেও সার্বিক ব্যঞ্জনা ও ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টির তাড়নায় সংক্ষিপ্ত কবিতার ঔজ্জ্বল্য কখনই খুব বেশি প্রভাবব্যঞ্জক হোতে পারে না; কেবলমাত্র ঐ বিশেষ ঔজ্জ্বল্যপূর্ণ শব্দ কিংবা বাক্যকে স্মৃতিতে সময়ে সময়ে ধরে রাখা ছাড়া; অথচ বিষয় ও ভাবনার বিস্তার সম্বলিত দীর্ঘ কবিতা পরিবেশ তৈরীর তাৎপর্য ও অনুভবের বিস্তারে উজ্জ্বল মনে হয়। 'বলে নাম বলে নাম অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে হাওয়া/খুঁজেও পাবে না তারে বর্ষার অজস্র জলাধারে', অথবা 'সে এখনও বেঁচে আছে কিনা তা সুস্থ জানি না' স্মৃতি-সুখ ও স্মৃতিক্লান্ত এইসব স্খলিত চরণের বয়নে এক দিগন্তে পরিপ্লাবিত আত্মস্বীকার ভাবনা থাকলেও এইসব কবিতার টুকরো টুকরো পঙক্তি ও শব্দ কখনোই তেমন দীপ্ত নয়, অন্ততঃ আয়তনগত ছোট্ট কবিতার প্রতি তুলনায় দীর্ঘ বয়নের এইসব কবিতার উজ্জ্বলতা সামগ্রিক পরিবেশ ও অর্থময়তার তাৎপর্যে উজ্জ্বল। এবং এই সব দীর্ঘ কবিতার ভাব-রূপ আমাদের নিমজ্জিত করে মানুষের অভিজ্ঞতার গভীর সমুদ্রে।

জীবনোপলব্ধির গূঢ়তর ব্যঞ্জনার তত্ত্বময় জিজ্ঞাসা মূর্ত হোয়েছে সুধীন্দ্রনাথের একাধিক বিবরণ ও তত্ত্বপূর্ণ দীর্ঘ কবিতার বয়নে, জীবনানন্দের আবেগ ও মনন সম্পৃক্ত বোধের অন্তর্গত ভাবনায়; আবার পরিবেশ ও বর্ণনা-নিপুণ প্রেমেন্দ্রের আয়তনে দীর্ঘ অধিকাংশ কবিতায় স্ফুরিত হোয়েছে যুগের অন্তঃসারশূন্যতার ছবি।

প্রেম ও ভালোবাসার আবেগঘন স্মৃতিকে মরমী করতে বুদ্ধদেব এগোলেন কবিতার দীর্ঘ আয়তনের দিকে—আবার দ্বন্দ্বমুখর মানসিকতা ও এই গতি

তীব্র আধুনিক জীবনের ভাষাকে জীবন-উজ্জীবনের ইশারায় ব্যক্ত করলেন বিষ্ণু দে তাঁর প্যাটানধর্মী সঙ্গীতময় দীর্ঘ ভাবনায় ঃ

দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী ! বর্শা তোলো ।
কেন ভয় ? কেন বীরের ভরসা ভোলো ?
নয়নে ঘনায় বারে বারে ওঠাপড়া ?
চোরাবালি আমি দূর দিগন্তে ডাকি ?
হৃদয়ে আমার চড়া ?
[ঘোড়সওয়ার ঃ বিষ্ণু দে]

কিংবা ;

আমার শ্রাবণ চায় তোমার বাহুর মৃদু কোণ
আবার আশ্বিন চায় রঙে রঙে তোমার আকাশ
বনস্থলী মন চায় স্তব্ধতায় সম্পূর্ণ কূজন
রোমাঞ্চে দু হাতে কবে তুলে নেবে আমার আঘ্রাণ
[অন্বিষ্ট ঃ বিষ্ণু দে]

আমাদের চরম চেতনার অন্তর ও বহির্গত ভাবনা বিন্যাস মুহূর্তের আলোক সম্ভব শৃংখলা-অভিজ্ঞতার মাধ্যম হোয়ে ওঠে । বাইরের পৃথিবী ও অন্তর আন্দোলনে স্থিত পৃথিবীর পারস্পরিক সম্পর্ক তখন মনে হয় ঃ .....a long poem is a test of invention.

দীর্ঘ কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের শ্রুতি শ্রবণসুভগ রম্যতার সিঁড়ি পেরিয়ে বিষয়ের আত্মস্থতায় অনন্ত মৃত্যুর মধ্যে লীন হোয়ে এক বিষাদ প্রতিমা আবহকে এই জগৎ ও জীবনের পরিক্রমায় অনিবার্য করে তোলে ; যে নিশ্চিত মৃত্যু-বোধের কাছে নতজানু নৈবেদ্যর সমর্পিত উচ্চারণ ঃ

হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর
মতো মিশে থাকতে চেয়েছি ।
[অন্ধকার ঃ জীবনানন্দ দাস]

জীবনকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে নিয়েই নয় ; গন্ধময় এই চিত্রল জগতের পুংখানুপুংখ ছবি চিত্রিত করতে গিয়ে জীবনানন্দ জীবনের গহনে প্রবেশ

করেছেন পরিমিতির সীমা ভেঙ্গে ফেলে কবিতার আয়তনগত দীর্ঘ যোজনায় ; যে পরম মুহূর্তে তিনি 'ইমপ্রেসনিস্টদের' মতো একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে কবিতায় একের পর এক ছবি এঁকে চলেছেন এই জীবনের ছায়াচ্ছন্ন গাঢ়তার, কখনো আবার মগ্ন হৃদয়ের বিষণ্ণ আর্তির, কখনো বা 'ন্যাচারালিস্ট'দের মতো ছবির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তিনি পৌঁছে গেছেন তাৎক্ষণিক বোধের কুয়াশা ছিঁড়ে 'নরম নদীর সারী ছড়াতেছে ফুল কুয়াশার' প্রকৃতির এই ঘন নীল কুয়াশার প্রান্তরে ।

জীবনানন্দ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞানকে কখনো আবেগরঞ্জিত, কখনো উষ্ণ মায়াবী স্পর্শে নীল করতে চেয়েছেন ।

বোধের অমিত পীড়নের মধ্য দিয়েই তিনি পৌঁছে গেছেন জীবনের বিস্ময়কর ঘটনার উন্মোচনে—আবার চেতনার আলোকিত উৎসবে ফিরে এসে অত্যন্ত আত্মগত হোয়ে উঠেছেন বোধ কিংবা অনুভূতির তীব্রতায় নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে নিয়ে এই দীর্ঘ ভাবনার ব্যাপ্ত নিয়মের কাছে ঃ 'বসন্তের জ্যোৎস্নায় অই মৃত মৃগেদের মতো আমরা সবাই' ।

জীবনের ব্যর্থতার এই বলীয়ান আশার ব্যঞ্জনাও সময়ে সময়ে এই ছায়াচ্ছন্ন গাঢ়তা জীবনানন্দের সমগ্র কাব্য জুড়ে আন্দোলিত হোয়েছে ।—জীবন সচেতনতা, জীবন সম্পর্কিত গহন গভীর অনুসন্ধিৎসাই এর কারণ । সময়, সময় চেতনা সম্পর্কিত ভাবনা এবং যে ভালোবাসার মুগ্ধ আলাপন অন্ধকার স্তব্ধতার মুহূর্তে বিদ্ধ করে ; সেই অপাপবিদ্ধ অন্ধকার আলোর অধিক বলে মনে হোয়েছে তাঁর কাছে ; যেমনটি লক্ষ্য করা গেছে জীবনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল রবীন্দ্রনাথের জীবন অভিব্যক্তির পর্যায়ক্রমিক ভাবনায় ঃ 'হেথা যে গান গাইতে আসা আমার/হয়নি সে গান গাওয়া'—এই বেদনাবিদ্ধ ভাবনার নিবেদন হৃদয় উদ্দীপক হোলেও, এই নীরব নিরাশার আর্তিই একমাত্র পরিচয় নয় ; এই মেঘাবৃত কুয়াশার আবরণ উন্মোচন করে জীবনের গভীরে প্রবেশ করলে লক্ষ্য করা যাবে অকৃত্রিম আশার উজ্জ্বল অভিব্যক্তি ঃ 'নীরব রাত্রে হারাইয়া যাক/বাহির আবার বাহিরে মিশাক/দেখা দিক মম অন্তরতম অখণ্ড আকারে ।'

[ক্রমশঃ]

তুষারাভ রায়চৌধুরী

প্রেমের ভুবন

আজ যাদের কথা আমার সব থেকে বেশী করে মনে পড়ছে, তারা হল বিনয়, জীবন এবং মধুমিতা। আজ থেকে দশ বছর আগে বিনয়ের বয়েস ছিল বাইশ এবং মধুমিতার সম্ভবত কুড়ি। মধুমিতার সংগে ওর যে একটা মনোরম প্রেমের সম্পর্ক ছিল, তা আমরা জানতাম। আমরা মানে ওর বন্ধুরা। আমাদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল চারজনকে ঘিরে—বিনয়, নিতাই, নির্মল এবং আমি। আমরা একই সঙ্গে কলকাতার একটা কলেজে বাংলায় অনার্স নিয়ে বি, এ পড়েছি, একই সঙ্গে মুখোমুখি বসে কলকাতার অনেক ছোট ছোট রেস্টুরেন্টে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প-গুজব করেছি, সিনেমা দেখেছি, খেলার মাঠে গিয়েছি। বলা যায়, আমাদের বন্ধুত্ব ছিল দেখবার মতন। শোনবার মতন।

বিনয়ই ছিল আমাদের মধ্যে সব থেকে বুদ্ধিমান এবং শান্ত। পড়াশুনোয় ওর কাছাকাছি আমরা যেতে পারতাম না। ছিপছিপে চেহারা। গায়ের রঙ কালো। মাথার চুলগুলো বড় বড় এবং চোখ দুটো হরিণের মতন দীঘল। কিন্তু তবু আমরা যখন ওর মুখে মধুমিতা নামে একটি অপরিচিতা মেয়ের নাম শুনলাম, তখন আমরা বিস্ময়ে চমকে উঠেছিলাম। নিতাই তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করে, বিনয়, মধুমিতা কে ?

বিনয়ের কণ্ঠস্বরে নিরুত্তাপ। শান্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়, একটি যুবতী রমণীর নাম।

—কিন্তু কে সেই যুবতী রমণী ?—নিতাই জানতে চায়। নিছক বয়েসের কৌতূহলে অবশিষ্ট আমরাও বিনয়কে চেপে চেপে ধরি।

বিনয়ের দীর্ঘ চোখে কৌতুকের ছায়া পড়ে। বলে, সম্প্রতি পরিচয় হয়েছে। মাস খানেক হল আমাদের পাড়ায় এসেছে। আগে কোথায় যেন ছিল, এখন বাসাবদল করল।

নির্মলের উৎসাহ চকিতে নিতাইকে অতিক্রম করে। বলে, ম্যারেড ?

—না।

—কে কে আছে ?

—বাবা, মা, ছোটভাই।

—চমৎকার। দেখতে কেমন ?

বিনয় সহজে মৃদু হেসে বলে, গায়ের রঙ আমার মতই।

—তার মানে কালো। নিতাই যেন কিঞ্চিৎ উৎসাহ হারায়। বিনয় সেটা লক্ষ্য করে। শান্ত স্বরে হেসে বলে, হ্যাঁ কালো। চোখদুটো আমারই মতন।

আমি যেন সকলের উৎসাহকে উজ্জীবিত করবার চেষ্টায় বলি, তাহলে দেখতে বেশ ভালই।

বিনয়ের বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখি না। আগের মতই বলে, ভালই।

—তাহলে কবে আমাদের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে ?

—আগে আমার সঙ্গে পরিচয় একটু গভীর হোক, তারপর।

—বেশ।

আমাদের উৎসাহ এইখানে যে, আমাদের কোন মেয়ে-বন্ধু ছিল না। ঝড়ের মতন বয়েস উড়ে যাচ্ছে, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ মুখোমুখি বসে গল্প-গুজব করার মতন মেয়ে-বন্ধু পাচ্ছি না। বিনয়ের দৌলতে যদি তার পড়শিনীর সঙ্গে বন্ধুত্ব জমে ত দারুণ হবে। অন্তত জীবনের রঙটা অন্যদিকে ফিরবে।

বিনয়ের মুখে মধুমিতার নামটা যখন প্রথম শুনলাম, তখন আমাদের কলেজ ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে। ফাইনাল পরীক্ষা আরম্ভ হতে আর মাত্র মাস তিনেক বাকী। সুতরাং আমরা একটু ব্যস্তও ছিলাম। আমরা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, অনার্সটা না পেলে যে আমাদের ভবিষ্যৎ একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে, সে ব্যাপারে আমাদের কোন দ্বিমত ছিল না। নিতাই কবিতা লিখত, কেবল সেই মাঝে-মধ্যে বলত, কাল রাত্রে একটা ছোট্ট কবিতা লিখলাম। প্রেমের কবিতা।

নির্মল উত্তর দেয়, কবিতা এক-আধটা লিখতে পার, বিশেষ ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি পাস করতে চাও ত, সাবজেক্ট ম্যাটার চেঞ্জ কর। নইলে মরবে।

আমি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করি, পরীক্ষার মুখে প্রেম করলে ফেল করতে পার, কিন্তু প্রেমের কবিতা অতখানি ক্ষতি নাও করতে পারে।

নির্মল আমাদের মধ্যে খুব বেশী বস্তু নিয়ে মাতামাতি করে। বংশানুক্রমিক ওরা ব্যাঙ্কের সঙ্গে বেশী যুক্ত। পাশ করলে সে অবশ্যই কোন ব্যাঙ্কেই চাকরী পাবে। বললে, নাও করতে পারে। সুতরাং ব্যাপারটাতে যখন সিওর হওয়া যাচ্ছে না, এখন রিস্ক না নেওয়াই ভাল। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় মা-কাকীমাকে প্রণাম করলেও পাস করতে পারি, না করলেও পারি। কিন্তু আমরা কি প্রণাম না করে রিস্ক নিয়ে পরীক্ষা দিতে যাই? সুতরাং বাবা নেতাই, সাবধান!

বিনয় নিরুত্তর। আজকাল ও প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে যায়। আমরা যখন সাধারণভাবে পরীক্ষা পাশের কথা ভাবছি, ও তখন হয়ত কি করে আরো ভাল রেজাল্ট করা যায়, তাই নিয়ে চিন্তান্বিত। কিছুক্ষণ উস্‌খুস করে। তারপর এক সময় বলে, আমার তাড়া আছে, উঠি।

নিতাই বলে, তুই যে দারুণ রেজাল্ট করবি, সেটা আমরা জানি।

বিনয় হাসে।

—ভাল কথা, তোর সেই মধুমিতার খবর কি?

—ভাল।

—আলাপটা জমল?

—জমছে।

—পরীক্ষার সময় কোন গণ্ডগোল হবে না ত?

—দেখা যাক।

পরীক্ষা যত এগিয়ে আসছে, আমাদের দেখাশুনো ততই কমে আসছে। আড্ডা বন্ধ। পড়াশুনোর ব্যাপারে কখনও কখনও আমাদের দেখা হয়, কিন্তু বিনয় একেবারে আমাদের ধারে-কাছে আসে না। ওর এই স্বার্থপরতায় একটু ক্ষুণ্ণ হই, কিন্তু ক্রুদ্ধ হই না। পরীক্ষা যতই এগিয়ে আসে, ততই যে ও বাইরের জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়, সেটা আমরা জানি। তাছাড়া ওর মুখের দিকে তাকালে আমাদের আর রাগ থাকে না। এমন কোমল নিষ্পাপ

মুখ ওর।

রুদ্ধশ্বাসে পরীক্ষা শেষ হল। যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। শরীরটাকে হাল্কা পালকের মত করে ছুটলাম আড্ডায়। নিতাই এবং নির্মল আগেই এসেছে। কিছুক্ষণ পর একটি মেয়েকে নিয়ে বিনয় এল। এই মধুমিতা। যে-বয়সে মেয়েদের সকলই ভাল লাগে, সেই বয়েস আমাদের। তবু মেয়েটির সুন্দর সপ্রতিভ চেহারা চোখে পড়ার মতন। সাধারণভাবে ভাললাগার ঊর্ধ্বেও মেয়েটির মধ্যে এমন কিছু আছে, যা আমাদের মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। হাসিটা তার দারুণ, চোখ দুটোও সুন্দর। চেহারাটার মধ্যে বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে। রঙের ব্যাপারটা মাঝামাঝি। আমাদের আড্ডায় বসে আমরা ওর অন্তরঙ্গতা পাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু মধুমিতা আমাদের দিকে না ঝুঁকে বিনয়কেই বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে। একসময় বেশ স্পষ্ট গলায় বিনয়কে বললে, তোমাদের পাড়াটা আমার তেমন ভাল লাগছে না।

—কেন? কি হল?

—সব বাড়ির সামনে একটা করে রক। আর সেগুলো সব সময়েই জমজমাট। ছেলে থেকে বুড়ো পর্যন্ত সবাই আড্ডা মারছে। সেদিন একটা রকের পাশ দিয়ে যাচ্ছি. একজন বুড়ো ভদ্রলোক বন্ধুকে বলছেন, মেয়েটা মাইরী চাবুক।

বিনয় হাসে। আমরাও। কিন্তু বিনয়ের মত অত নিঃশব্দে নয়, উচ্চকণ্ঠে। ঠিক আড্ডার মেজাজে।

নিতাই বলে, এটা ত সর্বত্রই।

মৃদু হেসে মধুমিতা উত্তর দেয়, হ্যাঁ। সেইজন্যে মাঝে মাঝে ভাবি লেডিজ পার্কের মত লেডিজ পাড়া থাকলে বেশ হয়। আপনারা জব্দ হন।

আমরা বুঝি, মধুমিতা ভাল কথা বলে। এবং তার কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারি, বিনয়ের প্রেমিকার নাম মধুমিতা। সে কথা খুব চাপাচাপি করতে ও স্বীকারও করে। সুতরাং এটা জানার পর মধুমিতা সম্পর্কে আমাদের উৎসাহ কিছুটা ভাঁটা পড়ে এবং আমাদের আড্ডায় বিনয়ের আসাও কমতে থাকে। কিন্তু নিতাইয়ের কবিতা লেখা কমে না, খেলার মাঠে নির্মলের ছোটাছুটি কমে না এবং খবরের কাগজে চাকরীর বিজ্ঞাপন দেখার উৎসাহও আমার এতটুকু কমে না।

এইভাবে দিন যায়।

ইতিমধ্যে পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুল। আমি, নিতাই এবং নির্মল অবাক হয়ে দেখি যে, আমরা তিনজনই অনার্স পেয়েছি, কিন্তু বিনয় ফেল করেছে। বিকেলে রেজাল্ট বেরুল এবং সমস্ত বিকেলটা আমাদের কাছে হলুদ পাতার মত বিবর্ণ হয়ে যায়। আমরা তিনজনেই মনে মনে মধুমিতাকে দায়ী করি।

দুদিন বাদে আমরা বিনয়ের খোঁজ করতে ওর বাড়িতে গিয়ে শুনি ও জামশেদপুরে গেছে। কিন্তু কথাটা যে মিথ্যা সেটা টের পেলাম মধুমিতার কাছ থেকে পরের দিনই। রাস্তায় ওর সঙ্গে দেখা। চেহারার সেই জৌলুস যেন কর্পূরের মত উবে গেছে। চোখ দুটোর ফ্রেমে কান্নার স্মৃতি ধরা আছে। বললে, রেজাল্ট বেরুবার পরেই ও কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছে।

—আপনাকেও কিছু বলে নি?

—না। তারপর যেন নিজেকেই শোনাতে থাকল মধুমিতা, আমাকে পাবার জন্যে ও পাগলের মত হয়ে উঠেছিল। আমি বেশ বুঝতে পারতাম ও পড়াশুনো পর্যন্ত অবহেলা করছে। আমি ওকে কত বুঝিয়েছি, ও শুনতো না। এমন সব ছেলেমানুষী করত, যা সহ্য করা যায় না। আমার মনটাকে পাবার পর ও আমার দেহটাকে ছেড়ে দেয় নি। আমি নিঃশব্দে সহ্য করেছি ওর নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে।

মধুমিতা থামল। কী বিষণ্ণ এই থেমে যাওয়া।

বললাম, কবে শেষ দেখা হয়েছে?

—সেদিন সকালেও। তখনও ওই ভীষণ বিকেলটা ওর সামনে আসে নি। উঃ, এখন আমি কি করি?

একটু সান্তনা দেওয়ার জন্যেই বলি, ব্যস্ত হবার কি আছে? প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেলেই ও দু'একদিনের মধ্যে ফিরে আসবে।

—কিন্তু যদি না আসে! হতাশায় ভেঙে পড়ে মধুমিতা।

—আমরা ত আছি। আমরা ওকে খুঁজে বার করবই।

করুণ চোখে মধুমিতা আমার দিকে চায়। আশ্চর্য, রমণীর মন!

কিন্তু দু'দিন দু'মাস হয়, দু'মাস দু'বছর। ইতিমধ্যে আমরা তিনজনেই চাকরী পেয়েছি। এবং ছড়িয়ে গিয়েছি তিন জায়গায়। আমি শিলিগুড়ি,

নিতাই ধানবাদে এবং নির্মল মুর্শিদাবাদে। কারও সঙ্গেই তেমন যোগাযোগ নেই। কেবল মধুমিতা আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। এবং প্রতি চিঠিতেই জানায়: বিনয় এখনও ফিরল না। আমার এই প্রতীক্ষার কবে শেষ হবে?

সেটা আমারও জানা নেই। তাই আমিও ওকে শুধু সান্তনা দিয়ে যাই: বিনয় আসবে, অবশ্যই আসবে। আপনার প্রেম ব্যর্থ হবে না।

ইতিমধ্যে পাকে-চক্রে আমার বিয়ে হয়ে গেল। বেশ সামাজিক ভাবে এবং সুন্দরী একটি যুবতীর সংগে। বিয়ের পর জানা গেল, আমার স্ত্রী পৌষালী মধুমিতার বান্ধবী, একই সঙ্গে কলেজে পড়াশোনা করেছে। এবং বিনয়ের ব্যাপারটাও সে কিছুটা জানে। এরপর থেকে মধুমিতা আমাকে আর চিঠি লেখে না, লেখে পৌষালীকে। এবং চিঠির ভাষাও পরিবর্তিত হয়েছে। বিনয়ের কথা না লিখে আমাদের সুখের কথা জানতে চায়।

পৌষালী প্রশ্ন করে, বিনয় কি মধুমিতাকে ভালবাসে নি।

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলি, নিশ্চয় বেসেছে। নইলে সে নিরুদ্দেশ হবে কেন?

—তাহলে এমন কেন হল? ও ফিরছে না কেন?

—ওর মত ভাল ছেলের পক্ষে এটাই ত স্বাভাবিক। ও জীবনে কোনদিন ফেল করে নি। সুতরাং এই ধাক্কাটা ও সহ্য করতে পারে নি। হয় মধুমিতাকে ভুল বুঝে, নয়ত নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জায় আর অনুশোচনায় ও দূরে সরে গেছে।

—কিন্তু মধুমিতার জীবনটা নষ্ট হচ্ছে।

আমি এ কথার কোন উত্তর দিতে পারি না। জীবনের মানেটা বড় জটিল। মধুমিতা এখন সেই জটিলতার গোলে ঘুরপাক খাচ্ছে।

একদিন বসন্তের বিকেলে মধুমিতার একটা চিঠি নিয়ে ও আমার কাছে ছুটে আসে।

—কি ব্যাপার?

—মধুমিতা আসছে।

—সে কি! কবে?

—আজই। এই দেখ চিঠি লিখেছে। তুমি একবার স্টেশনে যাও।

স্টেশনে পৌঁছে দেখি ট্রেন থেকে ক্লান্ত পায়ে নামছে মধুমিতা। একা।

যেন কত বুড়ী হয়ে গেছে। আমি ওর দিকে এগিয়ে যেতেই ও আমার দিকে চেয়ে হাসে। বড় করুণ সে হাসি। বলে, বিনয়ের একটা খবর পেয়েছি।

আনন্দে আমি চেঁচিয়ে উঠি, কোথায় সে ?

শান্ত কণ্ঠে মধুমিতা উত্তর দেয়, রাঁচিতে।

কিছু বুঝতে না পেরে বলি, সেখানে কি ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে মধুমিতা বললে, মাঝখানে একবার কলকাতায় এসেছিল। সম্পূর্ণ অপ্রকৃতস্থ অবস্থায়। আমাকেও চিনতে পারল না। বাড়ির লোকেদেরও না। তারপর ওকে রাঁচির পাগলা গারদে ভর্তি করা হয়েছে।

আমরা দুজনে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার নামছে। একটা সাইকেল রিক্সায় দু'জনে উঠে বসলাম। কিছুক্ষণ নিঃশব্দ। তারপর মধুমিতা বললে, এখানে কেন এলাম জানতে চাইবেন না ?

—বলুন।

—একটু বিশ্রাম চাই। বড় ক্লান্ত বোধ করছি। প্রেমের বড় জ্বালা।

—আপনি কি এখনও প্রতীক্ষায় থাকবেন ?

আমার মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে ও জানতে চাইল, আপনি কি করতে বলেন আমাকে ?

একটু দোলায় পড়ি। তবু একটু সহজ হওয়া যায় না ?

হাসে মধুমিতা। বলে, আর কত সহজ হবো। যে প্রেম করে, তার কি আর শক্ত হওয়া চলে ? সহজ হতে হতে তার ভিতরটা পাথর হয়ে গেছে।

আমরা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। পৌষালী মধুমিতার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। মধুমিতাকে দেখে ও ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে। মধুমিতা ওকে চুমু খায়।

আমাদের প্রস্তুতিটা ছিল এই রকম ঃ মধুমিতা এবং পৌষালী একটি ঘরে শোবে। আমি শোব পাশের ঘরে। কিন্তু মধুমিতা তা কিছুতেই হতে দিল না। জোর করে পৌষালীকে পাঠাল আমার কাছে।

সেদিন আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ফুটফুটে করছিল। আমার চোখে ঘুম নেই। ঘুমের মধ্যে পৌষালী আমার বুকের ভিতরে চলে এসেছে। আর আমি বিনয় এবং মধুমিতার কথা ভাবছি। বিনয়ের এই অবস্থার জন্যে যদিও

বা মধুমিতা দায়ী হয়, মধুমিতার জন্য তবে কে দায়ী ? বিনয় ? না কি শুধুমাত্র ওর ভাগ্য ?

পরদিন সকালে উঠে সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল। মধুমিতা আত্মহত্যা করেছে। বিষের জ্বালায় ওর কণ্ঠ নীল হয়ে গেছে। নিঃশব্দে পড়ে আছে যেন কার অপেক্ষায়। পাশে পড়ে আছে আমাকে আর পৌষালীকে লেখা একটা চিঠি ঃ

তোমাদের দু'জনকে দেখে আমি আমার রাস্তা ঠিক করে ফেলব বলে এতদূর আসা। বিনয়ের জন্যে প্রতীক্ষা করতে প্রস্তুত, কিন্তু এই দেহ নিয়ে আর নয়। এই দেহের বড় জ্বালা, আমি তাকে হত্যা করলাম এই ফুটফুটে জ্যোৎস্নার রাত্রে। এখন মুক্ত হয়ে বিনয়ের জন্যে অপেক্ষা করা আরো সহজ। অনেক সহজ। তোমরা আমার মৃতদেহটিকে সযত্নে পুড়িয়ে ফেলো। ভালবাসা নাও। তোমাদের মধুমিতা।

অতীন্দ্রিয় পাঠক

মধ্যবিত্ত ও মিনি বাস

কবে কি মানসিক অবস্থায়, আজ আর মনে নেই। কিভাবে একটা চাকরি পেয়ে গিয়েছিলাম। এবং জীবনটা তখন বদলে গিয়ে। একদম সময় পেতাম না। অনেকদিন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাওয়া হোত না। বন্ধুদের সাথে কালেভদ্রে কখনো। বাজার করবার সময় কই। বেশী বেলায় ঘুম ভাঙত। চাকরটা রোজ জুতো পালিশ সুরু করে দিয়েছিল না বলতেই। অফিসে যাবার সময় এবং অফিস থেকে ফেরার সময় রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে বসে আড্ডা মারছে ছেলেদের দেখে। ওদের যে কোন কাজ নেই, সময়ের অনর্থক অপচয় এটা বুঝতে এবং ওরা যেন কি রকম এটা ভাবতে সুরু করেছিলাম। তখন একটা স্বচ্ছন্দ। টাকা আসছে এবং যাচ্ছে। কখনো কম কখনো বেশী। এবং মাঝখানে আমি ভাসছিলাম! একদিকে চোখ স্থির রেখে দুপাশে যাতে না হড়কে পড়ে যাই সামাল সামাল এই রকম ভারসাম্য রেখে আমার চলা। কিভাবে যেন আমার জীবনটা বদলে গিয়ে এই রকম একটা চেহারা পেয়ে গিয়েছিল।

সেই চেহারার এখন আরো পরিবর্তন হয়েছে, বুঝতে পারি। বলতে গেলে আমি বাড়ির এখন সর্বেসর্বা। আমার কথামত সবার চলা উচিত আমার এইরকম মনে হয়। কিন্তু কেউ সেভাবে চলে না। আমি তা পছন্দ করি না। সেকথা তাদের বলা উচিত এটা বুঝি। কিন্তু বলি না, কি যে হয়, আমি কিছুতে বলতে পারি না। আমার বাড়িতে যে ধোপা কাপড় নিয়ে যায়। সেদিন শুনলাম পাড়ায় ভিড় জমে গিয়েছিল ওর বাড়ির সামনে। ধোপাটা ওর বৌকে কি এক কথা কাটাকাটি হয়ে চড় মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল। অথচ আজ অফিস থেকে ফেরার পথে দেখলাম, ধোপা আর ধোপানী ফুটপাত দিয়ে হেসে ঢলতে ঢলতে দামাল হেঁটে বেড়াচ্ছে। অথচ আমারও

স্ত্রীর সাথে প্রায় বনিবনা হয় না। এবং বনিবনা না হলেও কিছু বলি না, চুপ করে থাকি। খুব বড় জোর ভেতরে ভেতরে দাঁত কড়মড় করি, বুকের কাছটায় জ্বালা জ্বালা হয়। একসময় আবার সব ঠিক হয়ে যায়। বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে পাড়ার এক ভদ্রলোকের সাথে কথা হচ্ছিল। তার ছোট ভাইকে তার ভায়ের বন্ধু। অন্য পাড়ায় থাকে। দলবল নিয়ে এসে মেরে তার মুখ হাত জখম করে দিয়েছে। সূত্র নাকি ছেলেটি পাঁচ টাকা ধার করেছিল শোধ দেয়নি। অথচ আশ্চর্য, আমার অফিসের একজন সহকর্মী, যে আমার ছোটবেলার বন্ধু। বছর খানেক আগে দু'শ টাকা ধার করেছিল ওর বৌয়ের বাচ্চা হবার সময়। এ মাসে মধুপুর থেকে বেড়িয়ে এসে বলল, অনেক খরচ হয়ে গেছে, সামনের মাসে টাকাটা দেবে। আমি মাত্র এইটুকু বলতে পারলাম, আমারো বড্ড টানাটানি যাচ্ছে, একটা ধার করেছিলাম শোধ দিতে পারছি না। তাগাদা করছে বড়। যা হোক সামনের মাসে চেষ্টা করিস। কেন যে এমন অদ্ভুত ঘটে, সরাসরি কিছু বলতে বা করতে পারি না, ফলে মিথ্যে বলতে হয়।

ট্রামে বাসে আজকাল কেমন সহনশীল হয়ে উঠেছি একথা ভাবলে অবাক হই। আমার টাই ধরে কে একবার ঝুলে পড়েছিল। আমার তখন যা শোচনীয় অবস্থা। হৈ হৈ করে বাস থামিয়ে লোকটার কাণ্ডজ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করতে গেলে ফস করে বলে দিয়েছিল, কেন টাই পরে বেরোন মশাই। এবং আমি এতদিনে অনেক অভিজ্ঞ। এরপর কোন কথা বলিনি। পালিশ করা জুতোর ওপর কেউ ঝট করে পা মাড়িয়ে বা পা রেখে দাঁড়ালে অথবা ঝুলতে থাকলে। পালিশ করাটাই আমার অন্যায় হয়েছে এটা অনেক দিন অনেক কথা কাটাকাটির পর আজকাল চট করে বুঝে নিই। তাই আর কোন কথা বলি না। এই রকম সব ঘটে প্রতিদিন এবং এইভাবে আমি এখন একজন নিরাপদ অফিসযাত্রী।

অফিসে পৌঁছে আজকাল সব কিছু বন্ধ করে নিয়ে তবে বসি। গলা চোখ কান ইত্যাদি। কারণ ক বাবুকে যদি কিছু বলি দেখেছি কি করে যেন খ বাবুর অপমান হয়। বুঝতে না পারলেও একথা আমায় জানতে হয়। আর খ বাবুর কথা শুনে যদি হেসে ফেলি তবে ক বাবু মনে করেন আমরা কোন কুমতলব নিয়ে ঘোরাফেরা করছি। তাই আর। তবে হ্যাঁ, কোন কেচ্ছা-কাহিনীর ব্যাপার হলে অবশ্য অন্য কথা। তখন সবাই একেবারে নির্ভেজাল চিত্ত। আমিও নিরুদ্বেগ তাই সব খুলে দিই তখন। যেমন চোখ কান নাক

এমন কি দাঁতকটাও। এই সেদিন বড় সাহেব আমায় ধমকালেন। কি একটা চিঠি টাইপ হয়নি কেন জিজ্ঞেস করলেন। চিঠিটার ব্যাপার জানি না বলতে তিনি হুংকার দিলেন। কোন কথা শুনতে চান না এবং আমার যথাবিহিত ব্যবস্থা তিনি নেবেন। যখন তিনি কিছুটা শুনবেন না এবং আমার যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন আমার মনে পড়ল, আমার বাড়িভাড়া মাসে মাসে দেড়শ টাকা। বাজারে রোজ জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে। স্ত্রী ছেলেটা মা এরা সবাই অসুস্থ এবং মাসে প্রায় শ খানেক টাকার ওষুধ কিনতে হয়। একটা সেলাইকল অনেকদিন আগেই কেনার কথা কিন্তু প্রতি মাসে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে রাখছি। এবং এসব মনে পড়তে আমি আর কোন কথা বললাম না। চুপচাপ থেকে অর্থাৎ অপরাধ স্বীকার করে ফিরে এসে চেয়ারে। কি ব্যবস্থা আসে তার জন্যে বসে প্রতীক্ষা করতে থাকলাম।

এখন এই রকম আমি প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ঝড়ের মত সব কাজকর্ম সেরে দৌড়ই। বাস ট্রাম যা পাই সুবিধেমত তাতে ভিড় ঠেলে ধাক্কা খেয়ে ধাক্কা দিয়ে গালাগালি খেয়ে গালাগালি দিয়ে অফিসে যাই। আবার সারাদিন অফিস করে সেই ট্রাম বাস এবং আর সব আনুষঙ্গিক সমেত ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত বাড়ি ফিরে আসি। এমনি করে চলছিল শরীরে ক্লান্তির বোঝা বাড়িয়ে চলা। এ সবের মধ্যে কাগজে মিনি বাস সম্পর্কে মাঝে মধ্যে খবর পড়ে এবং আসছে এই রকম প্রতীক্ষার পর যেদিন প্রথম রাস্তায় একটা অদ্ভুত মাপের গাড়ি দেখে এবং সবাই সেইদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে। কেউ কেউ জানে এবং বলল, ঐ যে মিনি বাস। কিছুদিন দেখতে দেখতে মনে হল, আমার সাথে এর তো বেশ মিল। এবং এরপর তাকে আর অদ্ভুত মনে হল না।

মিনি বাস অর্থে খুব বড়ও না খুব ছোটও না। খুব বেশী ভাড়া না খুব কমও ভাড়া না। আরামে বসা যায় অথচ কিছু সময়ের জন্যেও নিজের হয় না। আমার মধ্যে যেমন একটা সমঝোতার মনোভাব গড়ে উঠেছে তেমনি কম বেশীর সাথে একটা সমঝোতার শরীর নিয়ে ও দিব্যি কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় চলতে লাগল।

এখন মিনি বাস কোলকাতাময় হয়েছে। কিন্তু দেখি, ফুলে ফেঁপে থাকা বাস ট্রামের পাশ দিয়ে ছিমছাম ভেতরে একটা সুশ্রী ছিমছাম। পরিচ্ছন্ন সব লোকেদের নিয়ে ওরা বেঢপ বাস ট্রামের পাশ দিয়ে নিজেকে ওসবের ছোঁয়া থেকে বাঁচাতে পালিয়ে চলে যায়। ওরা যারা মিনি বাসে অমন স্বচ্ছন্দ যায়।

ওখানে যারা বসে থাকে। ওরা কেউ ঝগড়া করে না, কথা কাটাকাটি করে না। আশ্চর্য। তারা নিজেদের মধ্যে কথাও বলে না। হয় সামনে চেয়ে থাকে স্থির দৃষ্টি অথবা বাইরের দিকে পাথরের চোখ নিয়ে। মাঝে মাঝে অকস্মাৎ একটা ছেলে আর একটি মেয়ে হয়তো কথা বলে, হাসে, পরস্পর। কিন্তু যেন ওরা একটি মোড়কে মোড়া। আর সবার থেকে বিচ্ছিন্ন। এইসব লোকেরা কি আমারই পাশ দিয়ে চলাফেরা করে, জানি না। পাশাপাশি নিশ্চয়ই ওরা কখনো সখনো এসে পড়ে। তবে নির্ঘাত মিনি বাস থেকে নেমেই চেহারাটা মানানসই বদলে নেয়। অনেকবার ভেবেছি একদিন মিনি বাসে উঠে পড়ে ওদের হাতে-নাতে ধরে ফেলব। কিন্তু হয়ে ওঠে নি। মাঝে মাঝে এগিয়ে দেখেছি সঙ্গে সঙ্গে চেহারা বদলে নেয়। ভেতরে পিঠ বাঁকানো অনেক লোক ভেতরের আনাচে কানাচেতে দাঁড়িয়ে এমন ভাবে যেন একটা ছোট ছাতার তলায় বৃষ্টি থেকে বাঁচতে অনেক লোক ভিড় করেছে। দেখেশুনে আমি সেদিকে আর এগোতে পারি না। মিনি বাস আমার কাছে উঠতে পারি এমন অবস্থায় কোনদিন এলো না।

একদিন অত্যন্ত জরুরী কাজ পড়ল। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মিনি বাসের কথা মনে হলো। অফিস থেকে বেরিয়ে বাস স্ট্যান্ডে গেলাম। মিনি বাসের জন্যে আজ আর লাইনের দিকে যেতে হবে না। দূর থেকে দ্যাখা যাচ্ছে মিনি বাসের ঢেউ। একের পর এক এসে সামনে দিয়ে ঢেউয়ের মত দুলতে দুলতে চলে যাচ্ছে। অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়েছি। মিনি বাসের এমন অনেক সময়। সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছেলেটা দরজা খুলে। ফাঁকা ভেতরটা হাঁ করা দাঁড়িয়ে থাকছে। এটা টালা পার্ক যাবে। কিন্তু স্টপেজে নেমে বাড়ি যেতে অনেকটা অথচ দু নম্বর বাসের টার্মিনাস থেকে একটু গেলেই বাড়ি। মিনি বাসে ভাড়া প্রায় আশি পয়সা বেশী। দূরে দোতলা বাসটা। হয়তো দু নম্বর হতেও পারে। হলে সময়ের তফাত খুব বেশী হবে না। পিছিয়ে এলাম মিনি বাসের সামনে থেকে।

দোতলা বাসটা এলো। লিমিটেড লাইন। এতদূরের স্টপেজে নামতে হবে, প্রায় তিন পোয়া মাইল বাড়ি যেতে। এখন যে কোন সময় বৃষ্টি। কবে একবার বাস থেকে নেমেই বৃষ্টি। তারপর ভিজে জ্বরে পড়ে তিনদিন অফিস কামাই। দু নম্বর হলে টার্মিনাসে অনেকক্ষণ বসা যায়। দরকার হলে নেমে রিক্সা এবং না ভিজে বাড়ি। বাসের পর আবার মিনি বাস এল।

এটা দক্ষিণেশ্বর। বি, টি, রোডের ওপর নামতে হবে। তবু অনেকটা হাঁটা পথ। ঝিরঝিরে বৃষ্টি হলেও রিস্কা নিতে হবে কারণ তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছনো দরকার। তবে তো আশি এবং পঞ্চাশ অর্থাৎ এক টাকা তিরিশ পয়সা বেশী। দাঁড়িয়ে, আছি আধঘন্টা। দু নম্বর আর কত দেরী করবে। দশ পনের মিনিটের জন্যে এই অতিরিক্ত এক টাকা তিরিশ পয়সা? মিনি বাসটা চলে গেল।

এরপর অনেক দোতলা বাস এলো। পাশাপাশি অনেক মিনি বাস। যে কোন সময় দু নম্বর এসে পড়বে অতএব মিনি বাসগুলো একের পর এক চলে যেতে থাকলো চোখের সামনে। এমনি করে প্রায় এক ঘন্টা পার হয়ে, ঠিক করলাম, যা হোক এবার একটা মিনি বাসেই উঠবো। অবশেষে উঠতে যাবো এমন সময় একটা বাস আসছে, মনে হচ্ছে দু নম্বর। ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি দুয়ের বি। ততক্ষণে মিনি বাস অনেক দূরে চলে গেছে। এরপর অনেকক্ষণ রাস্তা একেবারে ফাঁকা গেল। মনে হচ্ছে এবার দু নম্বর আসবে। কারণ এতক্ষণ দেরী হয়েছে, দেরীর একটা সীমা আছে। এ ছাড়া বেশ কিছুক্ষণ হল দুয়ের বি চলে গেছে। আরো পরে একটা মিনি বাসে আর কোন চিন্তাভাবনা না করে উঠে পড়লাম। জানলার ধারে বসতে সব কিছু যেন বদলে গেল। চটপট নেমে গিয়ে। কোনক্রমে দু নম্বরের দোতলায় চলে গেলাম। সকলের শরীর নড়বড় করতে থাকা, হাত পায়ের ভারসাম্য রেখে কোনক্রমে স্থির রাখা লাইনটার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বাসটা একদম ভাল চলছিল না। কত দেরী হয়ে গেল। যে জন্যে তাড়াতাড়ি সেই কাজ হবে কিনা সন্দেহ। মনটা যেন উড়ে যেতে চাইছে। অধৈর্য হয়ে কন্ডাক্টারকে বললাম, কি চলছে মশাই, গরুর গাড়ি। একটু তাড়া করুন।

কন্ডাক্টর প্রত্যয়ের সাথে বলল, চলছে এই ভাগ্যি। এই ড্রাইভার বলেই চালাচ্ছে। যতক্ষণ চলছে ততক্ষণই ভরসা। যে কোন সময় ব্রেক ডাউন হয়ে যেতে পারে।

আমার আর কিছু করার ছিল না। শুধু মনে হল, অনেক বয়েস হয়েছে, আজকাল দ্রুত বা সময়মত কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি না। নিজেকে এই রকম টেনেটুনে নিয়ে যেতে যেতে একদিন স্থির পাথর হবে যাব।

● কবিতা

গোপাল ভৌমিক

অন্য দিন অন্য মানে

কিছুতেই অন্য দিন আসে না জীবনে ;
হয়তো যতই ভাবি কামনাও করি
ততই সে সরে যায় দূরে থেকে দূরে
হয়তো এলার্জি তার আছে অন্বেষণে।

এক দিন প্রতি দিন সব দিন
যেন সব এক ছাঁচে ঢালা
বিধিবদ্ধ নিয়মের ক্রীতদাস হয়ে
আসে আর চলে যায় বৈচিত্র্যবিহীন।

অন্য দিন স্বপ্ন হয়ে হাতছানি দিয়ে তবু ডাকে ;
প্রতীক্ষায় কেটে যায় অমূল্য সময়
তবু অনুশোচনায় ভরে না হৃদয়
খোঁজে সে আরেক মানে অন্য দিনে যা লুকিয়ে থাকে।

শশধর রায়

অন্য দিন

অন্য মনে অন্য দিন,
অন্য রঙে অন্য সুর—
কে বাজালো বাঁশী
মধুর মধুর হাসি ;

কেড়ে নিলো অন্য দিনের অন্য রঙের সুর।

কে বাজালো বাঁশী
মধুর মধুর হাসি।

আমার দুখের সাগর
শিশির কণায়,
ভরলো যেন কানায় কানায়,
সব দুখীরে আপন করে
নিলো টেনে শিশির কানায়,
আমার দুখের সাগর
ভরলো যেন কানায় কানায়।
আমি ঐ বাঁশীর সুরে সুরে
আপনা ভুলে মরি ঘুরে ঘুরে,
অন্য মনে অন্য দিনে
অন্য রঙে অন্য সুরে
কে বাজালো বাঁশী
মধুর মধুর হাসি।

কবিতা সিংহ

রুমালে বেলফুল

রুমালে বেলফুল বেঁধে দুরন্ত বৈশাখে
কেন হতে উতলা অমল ?
নয়ন-সুকের ওই কোমল মেরজাই ভিজে ফুটত তুকের গেরুয়া
ও আমার চন্দন খোদাই অনুপম আত্মমগ্ন যুবা
রুমালে বেলফুল আহা রুমালে বেলফুল।

এখানে ধাঁধায় রঙ, ফুলে ফুলে ফেটে পড়ে সমস্ত বিকাল
তোমাকে অতীত থেকে পৌঁছে দেয় নীলবর্ণ ট্রেন
ব্যবধান জুড়ে দেয় মধ্যবর্তী রোমহর্ষ হাওয়া
গাঁটছড়া বাঁধা থাকে, মঠোয় বকুল।

যা কিছু ক্ষণিক অন্ধ সীমিত আতুর তাই কব্জা করে কাল
আমার অমল থাকে নাগালের অনেক বাহিরে
চাঁদের হাতল খুলে নেমে আসে প্রতিদিন রুমালে বকুল বৈশাখে
গন্ধ তার আমার নিখিলে !

রুমালে বেলফুল ! আহা রুমালে বেলফুল !

প্রসূন মিত্র

একুশে ফেব্রুয়ারী স্মরণে*

এখনো হৃদয় অস্থির রাজধানী
এখানে ওখানে চাপা পলাশের লাশ
গুরু গুরু মেঘ অগুরু বাতাস বিস্ফোরণের ত্রাস
ভেঙেচুরে পড়ে প্রপিতামহের বাড়ি
তবুও দাঁড়াও পথিক যেওনা চলে
ময়ূরপংখী ভিড়েছে সাগর দাঁড়ি।

ধসা ইমারতে চটা ওঠা শবাধারে
ভারা বাঁধা মনে কাণাগলি চোরাপথ
ভাঙা ডানা মেলে ফাগুনের পারাবত
গুলমোহরের বোবাধরা ডালে ডালে
তবু ফলন্ত একুশে ফেব্রুয়ারী।

কে কোথায় আছ কাছাকাছি দূরে দূরে
দেখ মাস্তুলে বসেছে ক্লান্ত কাক
যে দিবস গেছে তারই রামধনু ডাক
কোলাহলহীন বহু বন্দর ঘুরে
ঠোঁটে তুলে নেয় ইন্দ্রের মরকত

যায় খোয়া যাক হয়ে যাক রাহাজানি।
আমার হৃদয়ে সমাহিত বরকত
আমার হৃদয় সালামের রাজধানী ।।

বাংলাদেশ বেতার ঢাকার বিশেষ সাহিত্য অনুষ্ঠানে পঠিত।

শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায়

ভালবাসি তোমাদের

আত্মার স্বতন্ত্র আলোকে
আমি চেয়ে চেয়ে দেখি তোমাদের—

তোমরা যারা মূঢ়-ম্লান-মূক মুখে
সৃষ্টির উৎসবে দিতে চাও ভাষা,
হতাশায় ফাটা পোড়া মৃত প্রাণে
এক নদী স্নেহ দেবে বলে
জাগাতে চাও উত্তাল আশা ;

তোমরা, যারা উন্মাদ, বিনাশী নও
হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের হৈ হৈ কলরবে—
হৃদয়ের অমল সৌরভে, গানে গানে
একটি শপথে পথ বেঁধে দেবে বলে
পায়ে পায়ে অগ্রসর একতালে ;

(আর) আমি ভালবাসি তোমাদের
সত্তরের কবিদের ॥

নির্মল বসাক

সীমা সমুদ্র পারে

সরল জলের মতো সহজ গড়ুসে তাকে তোলা যায়
তৃষ্ণার ভিতরে
ভিজে যায় তৃষ্ণাময় পৃথিবীর শুষ্ক কণ্ঠনালী
তবুও জীবন কেন প্রতিপদে হেরে ফিরে আসে
নদীকে বানাতে চায় বাঁধ দিয়ে রমণীয় হ্রদ
স্থির জলে জমা হোক জীবনের সমস্ত বোধন
ঐশ্বর্যে-বৈভবে মানুষের কলুষ কালিমা চুঁয়ে পড়ে মানুষ জানে না

তোমাকে পেয়েছি আমি সত্যি কী পেয়েছি চিরন্তন
প্রশ্ন মানুষের
তোমাকে পেয়েছি কাছে—কথা বলে নেই
নির্বাক আমার কাছে তুমিও নিস্তব্ধ
শুধু সময়েরা কখনো জানে না স্থির হতে নিয়ে যায়
হাতের অর্পিত ফুল নৈঃশব্দ্যে কথা হয়

নিকটে রয়েছ তুমি তাই কী তোমাকে
অবহেলা করি আর ঐশ্বর্যে সাজাই
সীমা সমুদ্রের পারে শুধু শুধু বেদনারা বড় হয়ে ওঠে

নীরদ রায়

এক একটা সুগন্ধি সাহসের জন্যে

অথবা কেউ ফিরে গিয়ে বলবে নাকি—
সুচের ফুটোয় চোখ রেখে
এই যেমন ভালো থাকা স্বভাব,
নির্বোধ শব্দের চেঁচামেচি-ফিসফাস কত কি—
আসলে এই সামান্য দু একটা কথা দু একটা সংবাদ—
কানপাতলা মানুষ এরই মধ্যে সটান হেঁটে যান ;
ঠিক যেমন—যে যেখানে থাকেন
অভ্যস্ত হাওয়ায় যেমন আচমকা হাত
বাড়িয়ে খবর নেন—জানলার পর্দায় জল
ছিটিয়ে হাসতে থাকেন দু দিনের প্রতিবেশী ;
আসলে এক একটা সুগন্ধি সাহসের জন্যেই
এক একটা মানুষের সারা রাজ্যের দুর্ভাবনা।

রতন বিশ্বাস

কোথা থেকে কোথায় ফিরে যায়

শববাহকেরা সশব্দে চলে গেল,
পিছে পড়ে থাকে, অনাহার ক্লিষ্ট শিশুর দল
সাদা দাঁতের ফাঁকে কুড়ায় সাদা খই
চলমান সজ্জিত যানের না রাখে হিসাব।

কোথা থেকে আসে সব—
কোথা থেকে কোথায় ফিরে যায়।

শববাহকেরা সশব্দে চলে গেলে,
অপলক চোখে আসে জীবন,
আসে বেচাকেনা, সংঘাত
মোহ মায়া লালিত মন
শূন্যতার পরিমাপে পৃথিবীর বিদায় লগন।

দীপক কর

রক্তহীন, ঈর্ষে ও কষ্টের অন্ধকারে

ঘরের কোণে সেতারটা ধূলিমাখা বিষণ্ণতায়
সর্বক্ষণ আমাকে কেবল বিদ্রূপ করে ঃ
কী সুখ পেলে তুমি ? কী সুখ, আমাকে ছেড়ে !
তোমার কবিতা এখনো নাবালিকা
অথচ সময় গড়াতে গড়াতে দ্যাখো পড়ন্ত বিকেল।

তুমি কী জানো কবিতা যৌবনই বেশী ভালোবাসে !

কেউ ভালো কবিতা লিখলে এখন আমার ভীষণ ঈর্ষে হয়
কেউ ভালো বাজালে ভেতরে ভেতরে কষ্ট হয়
আমি না-কবিতা না-সেতার ঈর্ষে ও কষ্টের অন্ধকারে
ক্রমশঃই রক্তহীন হয়ে যাচ্ছি।

শিতিকেশ মুখোপাধ্যায়

দুটি আঁখি

অমানিশাঘোর
অবারিত রাত্রি অবগুণ্ঠনে
শুধু দেখা যায় মাত্র দুটি আঁখি
অতৃপ্ত বাসনা মলিন।

কালস্রোত বয়ে গেছে
এ বিনাশ আঁধার দেহে।
শরতের চাঁদ আর বসন্ত বাতাস
দেয় না সাড়া
শুধু জাগায় তৃষ্ণা আকাঙ্ক্ষা অবিরাম
অচ্ছেদে সরোবর সম্মুখেতে তার
আনন্দে করে পান শত শত জন।
কোনখানে ছিন্নবাসে বাইরের পথ ?
কে জানাবে নব বাস আছে কোনখানে।

[বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়……ইত্যাদি পড়ার পর]

জমিল সৈয়দ

সমস্ত রঙের ভিতর

সবুজ কণিকা দিয়ে ভরে তোলো ঘরের দেয়াল, ঐ বসবাস,
চোখের বৃত্তসীমায় স্তব্ধ হয় আমাদের মোহন তাড়স
সমস্ত রঙের ভেতর একটি অকুণ্ঠ লোভ সূর্যের বিভা জাগিয়েছে
কাঁচ বা পাথর নয়, অশ্রুবিন্দুর ভেতর একটি টলটলে মোম
আমাকে শিথিল করে, বাঁশীর ছিদ্রপথে সব সুর কান্না হয়ে যায়
মানুষের ঘর আছে, শুধু নেই আমাদের গানের ইস্কুল
আলোর সাতটি বর্ণে সাতটি জিভের মোচড় আমাকে আঘাত করে,
ঠোঁটের অতলে তার শব্দকল্লোল, বৃষ্টির ঘষটানো হাসি,
তার সব পতন ও বিকৃতি নিয়ে স্বপ্নের ভেতর যেন স্বপ্নাহত হয়
মেঘ ও রৌদ্রের মাঝে শুধু একফালি হাসি ভেসে থাকে।

অরুণাভ ভৌমিক

কষ্ট হয়

আর তো বেশীদিন নয়, দীর্ঘ একপলক
তারপরই তো টা টা হাসিখুশী বাল্যকাল
অর্পিত প্রেম নষ্ট শিল্প
ফের ভুলে যাই একটি একান্ত নারী শরীরের
মতো কোন শিল্প নেই
কষ্ট হয়, তখন বড় কষ্ট হয়

রয়ে যাবে শব্দের নির্জনতা যা
ক্বচিৎ খেলা হয়
তুমি একটু হেসে উঠলেই সব
মদির হয়, নদীর জলে পা ডোবালে
পূর্ণতা পাই, এত সব খেলা, মনে রাখা
না রাখা…
সব ভুলে যাবো, যেতে হবে
কষ্ট হয়, তখন বড় কষ্ট হয়।

তরুণ চক্রবর্তী

অভিমান

যতো অভিমান করো—
দূরে স'রে এসে আমি তাকে ততো মূল্যবান করি।
মাঝে মাঝে ঘুরে যাই হাওয়া-বদলের অজুহাতে
তোমরা সবাই যাকে বিষণ্ণ অসুখ বলে ভাবো,
আসলে এ অসুখ, ব্যক্তিগত সুখ,
অনেক যন্ত্রণা দিয়ে আমি তাকে নিজস্ব করেছি।

গান আর গাইতে পারি না,
কিন্তু অনুরণিত হওয়া? তাও তো সংগীত।
সমস্ত মূল্যবান অভিমান আমাতে বাজে।

দূরে থেকে আরো দূরে তাই
নিয়মিত আমি সরে সরে আসি,
যতো অভিমান করো—
দূরে এসে তাকে আমি ততোবেশী মূল্যবান করি।

ইন্দ্রজিৎ বসু

তোমার শরীরে চাঁদ

সারাটা দুপুর তুমি নিঃসঙ্গ সল্ট লেকে
একা একা দীর্ঘশ্বাস ফেলো,
কৃষ্ণচূড়া মাড়িয়ে দিয়ে প্রতিটি লগ্নে হও
তরঙ্গ-উদ্বেল,
সোনালী মাছের মতো হয়ে যাও কোন্‌দিকে
কখন উধাও?

দীপা-দীপালি আমার,
কি সাহসে ছুটে যাও কলির উপরে?
কেন একা একা বালুকণা কুড়াও?

তোমার শরীরে চাঁদ
সারারাত খেলা করে নীরবে…
অনন্ত নক্ষত্র কাঁপে, শিশিরের মত সব
মিশে যায় তরঙ্গে!

সালাহউদ্দিন চৌধুরী

উত্তর মেলেনি

কোথায় গেলে পাওয়া যাবে সেই সোনালী বাগান?
সোনার গাছে যেখানে থোকা থোকা ফুটে আছে
হিরের কুসুম,
কোথায় যাবো আমি, কোন্‌দিকে কোন্ পথ সঠিক?
সে কথা কি বলে দিতে পারেন?

বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে প্রশ্নমালা অবাক বাউল
উদাস দড়িতে মেলে দিয়ে হলুদ পোশাক
মৌমাছি দেখে ফের প্রশ্ন করে ঃ

কোথায় নিশ্চিত সুখ, সুখের আবাস ?
কোথায় রূপসী রমণীরা জলকেলি সাঙ্গ করে
শুকোয় আদুর গায়ে জলের চুমু ?

দিন মাস বৎসর কেটে যায়—কেউ
তার দিল না উত্তর।

সুকুমাররঞ্জন ঘোষ

কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি

সে আবার ক্ষুরধার ধ্বংসের কণ্ঠস্বর হয়ে
বেরিয়ে এলো বলে,
মসৃণে শান ধরানো লকলকে বৈদ্যুতিক জিহ্বা
দিক বদলের এই ফাঁকে
মাঠ প্রান্তর বনস্থলীতে ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাত ঘটাবে।

বহুদূরে অভিসন্ধিহীন একক নিষ্পাপ—
দৃষ্টি ছড়িয়েও সে
বিষণ্ণতম শোকের যন্ত্রণাদগ্ধ
গন্ধ-প্রতিলিপি পাঠাবে
ঝরা পাপড়ির কুঞ্চচূড়ায়
নিষ্ঠুর খেলার অঙ্গুলি সংকেত,
আড়াল শরীরের হিমনীল থেকে
অবিরাম বৃষ্টিপাত।
বিষণ্ণতম শোকের যন্ত্রণাদগ্ধ গন্ধ প্রতিলিপি
মাঠ প্রান্তর বনস্থলীমা—
ধ্বংসের কণ্ঠস্বরে, নিষ্ঠুর খেলা শেষে
সে ফিরে আসবেই কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি হয়ে
সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি পেয়ে।

মোহন মিত্র

তোমায় দেখে

তোমায় দেখে মনের মধ্যে একটা ইচ্ছে জন্মেছিল
চড়ক তলায় দোকান দেখে যেমন অনেক ইচ্ছে জাগে
কিংবা কালীপুজোর রাত্রে হরেক রকম ব্যাজির নেশা
বা এক রেস্টুরাণ্টে ঢুকে মেনু কার্ডে চোখ বুলানো
ঠিক তেমন ইচ্ছে নয়কো ওটা।

একটা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনে দুঃখ পাওয়া
ছাদে শুয়ে জ্যোৎস্না মাখা আকাশ দেখে উদাস হওয়া
রেলের বাঁশি কানে এলে বিদেশে মন ছোটে যেমন
ঠিক তেমন ইচ্ছে নয়কো ওটা।

তোমায় দেখে মনের মধ্যে একটা ইচ্ছে জন্মেছিল
যেমন তেমন ইচ্ছে নয়কো
যেন নেমে ভোরের সূর্য
আমার ভিতর বাড়ি আলো করে শান্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়

মন সমুদ্রে মন হিমালয়ে

বেদনায় ভরা ছিলো সেদিনের দিনগুলো
তপ্ত দিনের মতো জ্বলছিলো চিতার আগুন,
অশান্ত মনকে আমি পারিনি বোঝাতে—
যা কিছু সুখের বস্তু ক্ষণিক মাত্র।
তারপর কেটে গেছে রোদে-জলে ম্লানমুখে
কয়েকটি বছর।
সময়ের স্রোত ধরে সমুদ্র সৈকতে এসে
বৈরাগী মনকে আর বোঝাতে হয়নি
তুচ্ছ জীবন আর 'আমার আমার'—
সব কিছু ভুলে যাওয়া মনের সে নিঃসীম আনন্দ,
অসীম সমুদ্র বুকে ধরিত্রীর বিশাল হৃদয়ে

ভালবাসার অপার জ্যোতির্ময় রাশি
বহুদূর নিয়ে গেছে আমার জীবনকে।

কর্মের রথ চলে, ধীরে ধীরে ঢেউগুলো
ঢাকা পড়ে মনের অগোচরে,
কি করি? কোথায় সে সুখের নীড়।
খাঁচার পাখীর মত এই কি জীবন?
উদ্দাম চলার গতি শ্লথ হয়,
যৌবনে শিকল পরি আপন গণ্ডীতে।
এমন দুখের দিনে ডাক আসে হিমালয় থেকে
ছুটে যাই, প্রাণে জাগে শিহরণ
শান্ত শীতল বনে প্রতিধ্বনি শুনি,
তিনি এক তিনি এক মনে রেখ'।

মঞ্জুভাষ মিত্র

গাছ

সমুদ্রের আদিম নিঃশ্বাস
খেলা করে ক্ষয়প্রাপ্ত ও খোলা দরজায়
তুমি আজ সারারাত নিঃসঙ্গ খোঁজোনি অরূপ সত্তায়
মুখ ঢেকে শুয়ে আছো যতক্ষণ আলোরা না আসে
তখন বুকের চর্বি দুধ সাদা মোমবাতি জেবলে
খুঁজে দেখবে বুঝে দেখবে কাকে কাকে সঙ্গে নেয়া যাবে
টিয়াপাখী নিমফুল মেষাশিশু ঃ হয়ত অসীম এক
নীরবতা পাবে।

রাত্রির সাগর বাতাস
হাতির শুঁড়ের মত শুড়শুড়ি দেয় পায়ের আদিম পাথরে
পাড়ভাঙা নদী তীরে মাটি আঁকড়ে কেঁপে ওঠে ছবির হৃদয়
বিশুদ্ধ শূন্যতা
অজানা গ্রহের থেকে ছুটে আসছে উদ্বেল ধারায়
একটি বিবস্ত্র গাছ জ্যোৎস্নার ভিতরে শিকড় চালানোর মর্মান্তিক চেষ্টায়।

হিমাংশু জানা

তারপরে

তারপরে চাঁদ উঠলো
তখন তুমি অনেক দূরে
তারপরে মেঘ করলো
বুকের সারা জমিন জুড়ে
বৃষ্টি হ'লো পাহাড় ফুঁড়ে
কোন অচেনা ইস্টিশনে
দাঁড়িয়ে আছে তোমার গাড়ি
তাকিয়ে আছো আপনমনে
মায়ার খেলা ছায়ার খেলা
দেওদারের গহন বনে।

পায়ের কাছে খাম-পোস্টকার্ড,
লিখবে কাকে—কেনই-বা,
ফুলের ছোঁয়ায় ভুল হয়ে যায়
কেমন সব—রাত্রিদিবা॥

বরুণ মণ্ডল

ফুলদানিতে যখন ফুল থাকে না

ভালবাসা কখনও কখনও ফোটায় গোলাপ—
যার ঢলঢল পাপড়িতে এঁকে দিতে চুম্বন
কোনো নেই কুণ্ঠা।
ভালবাসা কখনও কখনও ফোটায় গোলাপ
তবু নিজেকে ফোটাতে গিয়ে কেউ কেউ
এক-ই বৃন্তে ফুটিয়ে ফেলে
এলোমেলো পাপড়ি গাঁথা কুসুম—
নিজেকে চিতিয়ে অচিরেই একে একে খসে পড়ে তা'রা।
নায়ক এবার বেরিয়ে পড়ে ফুলদানিটা হাতে নিয়ে
বড় রাস্তায়
বড় রাস্তা থেকে মেজো রাস্তায়

মেজো রাস্তা থেকে ছোট রাস্তায়
বাইরের দরজা পেরিয়ে উঠল
বুড়ী মাসীর তর্জনী বরাবর দরজায়
খুট্ খুট্……খুট্ খুট্……খুট্ খুট্…
চৌকাঠ ডিঙিয়ে উবু হয়ে কুড়োতে যায় মোহর
শরীরের গলিতে মোহর নেই
যা আছে, তা পাথর।

পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত

পর্যটকের ওষ্ঠে কাঁপে পায়েল

মাঘের দীর্ঘপথ ক্রমে শ্লথ হয়ে আসে,
ঘুম আসে, জানালার কাঁচ বেয়ে
নামে কিছুটি কুয়াশা।
রণপায়ে জ্যোৎস্না মাড়িয়ে যায় প্রপেলার আঁচ ;
পায়েল কেমন আছে ? চিঠি আসে, রোজ চিঠি আসে।

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

উট

আমার বৈভব
চোখ, কান, কিছু বুদ্ধি, বুঝবার কিছুটা আগ্রহ,
এই সব।
দেখাশোনা চেনাজানা মাঝে মাঝে যখন দুঃসহ,
শর্ট সার্কিট হয়ে অন্ধকারে ডুবে যায় মন,
মরুবক্ষে উট এক ক্লান্ত পদে তখন তরাসে
আমার জীবন
খোঁজে শান্ত প্রেরণার জলাধারে, কবিতার ঘাসে।
সময়ের পিঠে বয়ে নিরন্তর বদরী কেদার
যাচ্ছি, আসছি,
পদতলে ফেটে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে শংকার বরফ দেদার,
বাঁকা চাঁদ ঠোঁটে এঁকে হাসছি, হাসছি,
ফু দিলেই ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাচ্ছে বিপদের ঝাঁক।
এতটা সাহস বুকে দিনরাত দিলেও পাহারা—
যতদূর যাক্—
অন্নহীন, পিপাসার্ত জাহাজের চোখে দিন ধূসর সাহারা।

একটা নিশ্চিত বিশ্রামের জন্য

বাস্তবের পথে, পায় পায় পিছু হটা,
—নাচঘরে যেন এক মদ্যপের মতো।
ছন্দে-তালে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে হৃদয় যন্ত্রণা,
ক্রমশই বাড়াকমা।—অথবা নিশ্চয়,
তুমি আমি নিয়তিকে নিশ্চিত ভেবে
হতাশায় ডুবে মরি, পথ নেই জেনে।

কিন্তু, একটা নিশ্চিত বিশ্রামের জন্য,
—এসো না লড়াই করি, হৃদয়ের সাথে।
বাস্তব কি বস্তু, তা অনুভব নিক্তিতে—
মেপে নেব—জীবনের কানায় কানায়।
জীবন দুয়ারে ; তুমি আমি গস্তদার।
ফাঁকিজুকি, বুজরুকি অথবা সান্তনা ;
মেনে নিতে অপারগ, অযৌক্তিক কিছু
—শুধু একটা নিশ্চিত বিশ্রামের জন্য।

চিত্রভানু সরকার

ফুলের সৌন্দর্য

শেষ বিকেলে মোম-প্রদীপ গলে পড়ে
দেয়াল থেকে পলেস্তার
তার স্মৃতি যেন।

রাত হলে ডাকে না কাক
ভোর সে অনেক দূর।
স্মৃতি গলে গলে পড়ে
জমা হয় মাটি পাত্রে।

আলো থেকে অন্ধকারে সময়ের পরিবর্তন
তারপর, স্মৃতি গলে গলে পড়ে অন্ধকারে
কালো বেড়াল আঁচড়িয়ে দেয় ফুলের সৌন্দর্য

একা

কে ওকে ডাকছে ? সন্ধ্যে হুদ ? কিংবা কেউ নয় ?
সংসারের শেষ লক্ষ্মীঝাঁপি, ব্যাপ্ত মূলধন ?
উত্থান পতন নেই। শোকতাপ আছে ? ঘুমিয়ে রয়েছে !
মাদকতা না সম্মোহন ? সে কি পেয়েছিল কোন রমণীর স্বাদ ?
সুখ নয়। দুঃখ তাও নয়। আজ সে কি বত্রিশে আশীর বিদায় ?
বিস্রস্ত বিছানা ঘরে নির্বাসিত অতি সাধারণ একজন,
অনুযোগ নেই, অভিমানও জড়ো করা নেই তার।
জন্মেছিলো। বেঁচে আছে, একা একা মরবার তরে।

শিশির ভট্টাচার্য

বাঁকটা পেরোলেই

বাঁকটা পেরোলেই নদীর চর
বদন মাঝির ভিটের পরেই
লক্ষ মাণিকে লক্ষ সূর্য জ্বলে—
নদীর জলে তোমার হাতছানি
তখন আমি স্বপ্নে এসে নামি।

বিকেল ফুরোলেই ঝিঁঝির সারঙ
আসরে জোনাকি সন্ধ্যা নাচে।
ফেউ ছমছম রাতের আঁধার বাতির ছায়ায়
বাইরে মনের না-দেখা ছায়াটা ভীষণ বড়ো।
তখন আমি স্বপ্নে হেঁটে যাই।
মাঠটা ছাড়ালেই সীমানা শহরের।
না-রাত না-দিন আলোর আওয়াজ
রেশন তুলতে লাইনে দাঁড়ালে
চলিষ্ণু পোস্টারে ভিড়।
তখন আমি হোঁচট খেয়ে জাগি
অথচ মাঠের বাঁকটা পেরোলেই
বদন মাঝির ভিটের পরেই—
নদীর জলে তোমার হাতছানি॥

আগামী সংখ্যায় ঋষিণ মিত্র কর্তৃক এই কবিতাটির স্বরলিপি প্রকাশিত হবে।

দুটি বিদেশী কবিতা ঃ

লিভারপুল
ব্রায়ান্ প্যাটেন্

ব্রায়ান্ প্যাটেন্ লিভারপুলের তরুণ ইংরেজ কবি। জন্ম ১৯৬৪ সালে। তিনি মনে করেন, কবিতা একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়, শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপার নেই এখানে। এই শতকের শেষ দিকের কবি হলেও তিনি রোম্যান্টিক ধারার পুনরুজ্জীবন চান। তাঁর কবিতায় এমন অনেক বিষয় আছে যা আমাদের টেনে নিয়ে যাবে অন্য এক কবিতার জগতে এবং আমাদের মনে হতে পারে 'আমরাই শেষ রোমান্টিক'—এই মন্তব্য হয়ত এখনো শেষ সত্য নয়।

ভোরের নৌকোয়

ভোরের নৌকোয়
আসছি জেগে জেগে
শূন্য তীরভূমি, আমি ভাবছিলাম
তার সম্পর্কেই, তার
অনেক নিষেধ,
অনেক চিহ্ন, কিন্তু
আমায় কেউ পথ দেখানোর নেই
এখান থেকে, কেউ নেই
সেখানে নিয়ে যাওয়ার।

সেই একই প্রতিবিম্ব

সেই একই প্রতিবিম্ব ;
তোমার ভ্রাম্যমান নগ্ন তনু হেমন্তের নদীতে,
তোমার শরীর বাষ্পময় বৃষ্টি ঢাকা ;
নীল আর ধূসর ফোঁটাগুলো ঝরছে তোমার গা থেকে,

তুমি যখন কথা বলো
পাতাগুলো ঝরে পড়ে আর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

সর্বদাই তোমার যুগল স্তনের প্রতিবিম্ব,
সামুদ্রিক উদ্ভিদের প্রচন্ডতার
স্পর্শমাত্র কেঁপে ওঠে ; মাছ
মিলিত হয় তোমার নিচে ; তোমার শরীর নীল, তোমার
ছায়া অনুসরণ করে যায়,
দুই-ই ভৌতিক মনে হয় দূরের বাগান থেকে
এক ভীত দর্শকের কাছে।

সেই একই প্রতিবিম্ব
কিন্তু একটা ফার্ণঘেরা হ্রদ,
এবং সবেমাত্র দেখা যাচ্ছে কুয়াশার ভেতর দিয়ে
হাজারখানেক প্রেমিক তোমায় অনুসরণ করছে নগ্ন
ভোরবেলার প্রান্তে একফোঁটা চিহ্ন না রেখেই।

অনুবাদঃ অর্ণব সেন

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকেঃ

আসাম

দেবতোষ রাঘবোয়া

বৃত্ত

আমার সমগ্র সত্তা কেঁপে উঠলো।
শরীরের শিরা উপশিরা ভেদ করে
বয়ে গেল এক প্রবল উত্তেজনা।
অচেনা ভাবের চেনা সুর
আমাকে ভীত আর বিহ্বল করে ফেললো।
তারজন্যে আমি আর কিছু বলতে পারলাম না।
পুনরায় সাহস নিয়ে
ধীর গতিতে ঘুরে এলাম চেতনার প্রান্তরে।
জানলাম আমিই শেষ যাত্রী
এই অচিনপুরের ঘাটের।
আমার রাগ হয়েছিল।
নীরবে পাটনীর প্রাপ্য দিয়ে ভাবলাম বিদায় নেব।
আমি লক্ষ্য করলাম—
আঁধি ভেদ করে কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না, আমাকেও না।
বৃত্ত পথের পথ যাত্রায় ক্লান্ত হলাম, স্থির হলাম
এবার কিন্তু আমার রাগ হয়নি,
কেননা বুঝতে পেরেছি আমার কাছে আমি একা।

অনুবাদঃ শতদল দত্ত

শুক্লা দের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'মিছিলে তোমার আলো' পড়া গেল।

কবিতা নিয়ে আলোচনা করা আমার কাছে এক কঠিন কর্ম। কবিতার রসাস্বাদন মূলত বোধনির্ভর। কাজেই তার রস উপভোগ করা এক বস্তু কিন্তু তা প্রতিস্থাপন করা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। তবুও অনেক সময় না করে উপায় থাকে না কারণ কোন কোন বিষয়ে বলতে বা লিখতে পারলে আনন্দ পাওয়া যায়।

'মিছিলে তোমার আলোর' ছত্রে ছত্রে যেমন অচটুল রোমান্টিকতা তেমনি এক গভীর বিষণ্ণতায় আত্মমগ্ন সে ; যদিও শুক্লা দে এক বিশ্বাসের ভুবন থেকে বাইরের জগতটাকে দেখতে চেয়েছেন তবুও সেই পৃথিবী তার পারিপার্শ্বিকতা তার মানুষজন সহ কোথাও অস্বাভাবিক ভাবে স্বপ্নালু হয়ে ওঠে নি অথচ চিত্রকল্পে রচনায় অনিন্দ্যসুন্দর, প্রতি পদপাতে এর কাব্যময়তা—যা, কবিতাই পাঠককে অতি সহজে মগ্ন করে—অন্তত আমাকে করেছে।

বক্তব্যটুকু 'মিছিলে তোমার আলো'-র কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃতির মধ্যে তার কিছুটা হয়তো প্রতিফলিত হবে।

'প্রতিদিন কতভাবে কি জানি কোথায়
নিঃশব্দে পৃথিবী চিরে ট্রেন চলে যায়
নিরুপায় শ্রীকান্ত দাঁড়িয়ে থাকে একা—
সম্পূর্ণ হৃদয় মেলে
অধরার আলোক নির্ঝরে' (কমললতা)

অচতুর চন্দনের বন
বিক্ষত বুকের পরে সুগন্ধ প্রলেপ
প্রত্যহ স্নানের মাঝে সুবর্ণরেণুর সংযোজন
ক্রমশ নতুন মুক্তি নতুন জীবন (ইচ্ছা)

—বিশ্বাস উদ্ধৃতিগুলি আমার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে।

—আশিষ শিবনাথ

মিছিলে তোমার আলো/শুক্লা দে মানবতা প্রকাশন। মূল্য ঃ চার টাকা

২

'নিমগ্ন সংলাপ' তরুণ কবি প্রদীপ রায়চৌধুরীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। তার মানে কবি যাত্রাপথে থেমে যাননি। নিজের ফসল আশেপাশে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলছেন দীর্ঘকাল আগের উজ্জয়িনীর তীরে ফেলে আসা মৈত্রেয়ী অমৃতের ঘ্রাণ ভেসে আসে/রজনীগন্ধার পবিত্র সকালের স্বপ্ন চোখের জলের দাঁড়ে প্রকাশ্যে দোল যায়/অসাক্ষাতে দিনে দিনে বেড়ে গেছে নদীর চরের বালি/সংক্রামক ব্যাধির মতো দুঃখ ছড়িয়ে পড়ে অনিচ্ছুক শরীরের পাটাতন জুড়ে। এই সব কথাবার্তা কবিতার মধ্যে খুব আন্তরিকতার মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছেন। কারণ আমরা জানি আমাদের দুঃখ আছে, আমাদের আনন্দ আছে, স্মৃতি ভালবাসা সব কিছুই রয়েছে। কেননা এগুলি বাদ দিয়ে মানুষ হতে পারে না। কবিও বাদ যাননি। কবিতাগুলি পড়ার পর সেই কথাই মনে হল। এবং এই মনে হওয়ার জন্যই কবি সার্থক। তিনি আমাদের তাঁর কবিতার সঙ্গে একাত্ম করতে পেরেছেন। এটা একটা মস্ত গুণ। এইজন্যই আমরা কবির সংগে বলতে পারছি—ভালোবাসা আমার প্রিয় স্বর্গের অনুভূতি, কস্তুরী নাভির গোপন গভীরে আগলে রেখে তাকে শুধু কবিতায় স্মরণ করি বারবার নিমগ্ন সংলাপে।

—জীবন সরকার

নিমগ্ন সংলাপ/প্রদীপ রায়চৌধুরী
মণি প্রকাশনী, কলকাতা-২৩ দাম ঃ চার টাকা।

বীরভূম

কবিরুল ইসলাম—দীর্ঘদিন ধরে কবিতা লিখে আসছেন। আধুনিক কবিতার জগতে একটি বিশিষ্ট নাম। সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরাজীর শিক্ষক। মিষ্টি ব্যবহার। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কুশল সংলাপ' দ্বিতীয়—'তুমি রোদ্দুরে ওদিকে।'

অনুপম দত্ত—খুবই ব্যস্ত মানুষ। সাহিত্যের সব কটি শাখাতেই সমান দখল। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাটকগুলি কলকাতা এবং বিভিন্ন স্থানে অভিনীত হচ্ছে। বিশেষ সময় বিশেষ কাজে ব্যাপৃত, কখনো বাটিক, কখনো কবিতা। কখনো ছবি আঁকা কখনো খড়ের তৈরী ছবি করা। দুবরাজপুর সারদা বিদ্যাপীঠের বাংলার শিক্ষক। কাব্যগ্রন্থ ঃ 'গ্রীষ্মের নগরে প্রতিষ্ঠিত'। গল্পের বই ঃ 'পুবের জানালা উত্তল আকাশে ভোর।'

রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়—কবিতায় মিষ্টি হাত। মাঝে মধ্যে প্রবন্ধ লেখেন। পরিবার-পরিকল্পনা বিভাগে চাকুরী করেন, থাকেন সিউড়ী।

সুধীর করণ—সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ। কবিতা লেখেন। তরুণদের কবিতার উপর তাঁর আস্থা প্রবল। ব্যস্ত মানুষ, কম লেখেন।

সুভাষ দত্ত—বীরভূমের আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় কবিতা লিখে সুনাম অর্জন করেছেন। মিশুকে প্রকৃতির। স্পষ্ট বক্তা। নিজে হাতে লেখা পাঠাতে পারেন না—এমনি কুঁড়ে। কাব্যগ্রন্থ 'আমি মাদল লি আইছি'।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়—আধুনিক কবিতার জগতে এক বিশেষ নাম। তবে আজকাল খুব কম লেখা চোখে পড়ে।

জয়ন্ত চক্রবর্তী—'অন্যদিন' পত্রিকার বীরভূমের প্রতিনিধি। কবিতা, গল্প লেখেন। নিজস্ব আঙ্গিকে কবিতা লেখেন। বেকার। কবি সভার খবর পেলে সব কাজ ফেলে ছুটে যান। সম্পাদিত পত্রিকা, 'মানসলোক' পত্রিকা। দুবরাজপুর স্টেশন মোড়ে প্রাত্যহিক কবিদের আড্ডা বসান।

তাপস ভৌমিক—কবিতার সুন্দর হাত। বর্তমানে কলিকাতায় প্রবাসী। গদ্যেও সুন্দর হাত। সম্পাদিত পত্রিকা 'মানসলোক'। তাঁর পত্রিকায় তরুণদের স্থান আগে ; ঠিকানা ঃ দুবরাজপুর ঃ বীরভূম।

সমরেশ মণ্ডল—সত্তর দশকের নিজস্বতম কবি। তবু আড্ডা ভালোবাসেন। মিষ্টি কবিতা লেখেন, একটু রোমান্টিক। সম্পাদিত পত্রিকা 'শাশ্বতী'। কাব্যগ্রন্থ ঃ 'জিরাফের শিস'।

সুবীর দাশ—লেখেন কম। খুব যত্ন করে একটি পত্রিকা বের করেন, নাম 'কোরক'।

সন্তোষ মণ্ডল—কবিতা এবং গল্প লেখেন। লেখেন ভাল—কিন্তু পাঠান না কোনো কাগজে। 'মানসলোক' পত্রিকার সঙ্গে জড়িত।

সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়—কবিতা লেখেন। চাকরী করেন। একটি কবিতা প্রকাশ করতেন। এখন বেরোয় কিনা জানি না। একটি কাব্যগ্রন্থ আছে।

আশানন্দন চট্টরাজ—প্রবীণ কবি। সব কিছুই লেখেন। লোকের সঙ্গে ঝগড়া করেন। বাউল গানে সিদ্ধহস্ত। একটি রেকর্ড হয়েছে—গেয়েছেন পূর্ণ দাস। নিজে অভিনয় করেন। তার থলেতে সর্বদাই কোনো পত্রিকা থাকবেই।

স্বপন পাল—কবিতা লেখেন এবং অভিনয় করেন। নিজের লেখা নাটকও অভিনীত হচ্ছে সম্প্রতি।

সৌমেন অধিকারী—কবি মূলতঃ শিল্পী। শান্তিনিকেতন কলা ভবনে চাকুরী করেন। ঘুরতে ভালবাসেন।

একরাম আলী—কবিতা লেখেন। এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত। বন্ধু-বৎসল।

জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়—বীরভূমে মহিলা কবির সংখ্যা নিতান্তই কম। জয়িতা তাদের মধ্যে একজন। খুব ভালো লেখেন। থাকেন শান্তিনিকেতনের বাতাসে।

মনুজেশ মিত্র—বোলপুর কলেজে অধ্যাপনা করেন। দীর্ঘদিন কবিতা লিখছেন। প্রতিষ্ঠিত কবি।

অশোক সাহা—শিক্ষকতা করছেন বোধহয়। কবিতা লেখেন। মিষ্টি হাত।

রাধাদামোদর মিত্র—প্রাক্তন জমিদার। প্রবীণ। কবিতা লেখেন।

স্বাধীন গুপ্ত—হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক। কবিতা লেখেন। কম লেখেন। ব্যস্ত।

কিশোরীরঞ্জন দাশ—হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক। কবিতা এবং প্রবন্ধ লেখেন। চন্দ্রভাগা এবং বীরভূম সাহিত্য পরিষদের মূলসূত্র 'বীরভূমি'র সঙ্গে জড়িত।

মহাবীর রিংসিয়া—হিন্দি কবিতা লেখেন। খুব রাগীদার। মিষ্টি ব্যবহার। লেখায় রোমান্টিক।

সুজিত রায়—কবিতা এবং গল্প লেখেন। একটি 'জোনাকি মন' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন।

সিদ্ধার্থ মজুমদার—কবিতা লেখেন। কম বয়স। ভালো লেখা।

বীরভূমে হয়তো আরো কবি রয়েছেন তাঁদের আমি এখনো জানি না। বীরভূমে আসার পর যাঁদের কথা আমি শুনেছি—তাঁদের কথা লিখলাম। যাঁরা এই লেখায় বাদ পড়লেন—তাঁরা নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।

জাগরী পত্রিকা আয়োজিত কবি সম্মেলন

সম্প্রতি অরবিন্দ ভবনে জাগরী পত্রিকা আয়োজিত এক কবি সম্মেলন হয়ে গেল। অপূর্ব সাহার দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করার পর কবিতা পড়লেন—জীবন সরকার এবং আরো অনেকে।

স্টুডেন্টস হলে ছোট গল্পের সভা

ছোট গল্প লেখকের সমস্যা নিয়ে এক আলোচনা সভা হয়ে গেল। এই সভা ডেকেছিলেন সুব্রত নিয়োগী, সমীরকান্তি বিশ্বাস, কল্লোল মজুমদার। সভায় বহু গল্পকার উপস্থিত ছিলেন। অনেকেই বললেন। অতীন্দ্রিয় পাঠক ও জীবন সরকার বললেন না! অনুষ্ঠানটি মনোযোগ সহকারে শুনলেন।

বেহালায় কবি সম্মেলন

ঋক মহুয়া পত্রিকা আয়োজিত এক কবি সম্মেলন হয়ে গেল এই কিছুদিন আগে। কবিতা পড়লেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়, সামসুল হক, রবীন সুর, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, জীবন সরকার, অশোক মণ্ডল এবং আরে অনেকে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করলেন সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধুপগুড়িতে কবি সম্মেলন

এস, টি, এস-এর উদ্যোগে এক কবি সম্মেলন হল। কবিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত, অন্যমন দাশগুপ্ত, চিত্রভানু সরকার এবং আরো অনেকে।

কবি কলরব

গত ১৯ই মার্চ রোববার যীশু কবিগোষ্ঠী আয়োজিত পুরুলিয়ার শ্যাম ধর্মশালায় কবি কলরব হয়ে গেল। এই কলরবের সকাল সন্ধ্যের দুবেলা অনুষ্ঠানে কবিতা পড়েন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নবনীতা দেবসেন, যোগব্রত চক্রবর্তী, কমল চক্রবর্তী, মৃদুল দাশগুপ্ত, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, বুদ্ধদেব মুখোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গৌতম চৌধুরী, অশোক দত্ত, মাধবী দে, কল্লোলশ্রী মজুমদার এবং সৈকত রক্ষিত, নির্মল হালদার।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন 'আমরা সত্তরের যীশু'র সম্পাদক প্রতুল দত্ত।

এই কবি কলরবে আবৃত্তি করেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আধুনিক কবিতার গীতিরূপ পেশ করেন ঋষিণ মিত্র।

ত্রিবৃত্ত পুরস্কার

১৯৭৬ সালে ত্রিবৃত্ত পুরস্কার যাঁরা পেলেন ঃ

উপন্যাসের জন্য—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় [নয়ন শ্যামা]

গল্পের জন্য—সমীর রক্ষিত [বন্যার পরে বাড়ী ফেরা]

প্রবন্ধের জন্য – সুকুমার ভট্টাচার্য [টোটা কাহিনী]

পত্রিকা সম্পাদনার জন্য—কল্যাণ চক্রবর্তী [সরবারী সাহিত্য]

কবিতার জন্য—শংকর চট্টোপাধ্যায় [কেন জন্ম—কেন নির্যাতন]

কোচবিহারে অক্টোবর মাসে এই অনুষ্ঠান হবে।

একক নজরুলগীতির অনুষ্ঠান

১১ই জ্যৈষ্ঠ কবি নজরুলের জন্মদিনে রামমোহন মঞ্চে এক স্মরণীয় সন্ধ্যা হয়ে গেল। একজন তরুণ উদীয়মান শিল্পী গৌতম সেনগুপ্তের একক সংগীতানুষ্ঠান। আয়োজন ঃ রাণার সাহিত্য পত্রিকা। শিল্পী মোট ছাব্বিশটি গান পরিবেশন করেন। যাঁরা এই তরুণ শিল্পীর কণ্ঠের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা দেখেছেন কি অপূর্ব শিল্পীর গায়কী ঢং। কোন রকম বিরাম না দিয়ে একভাবে পরপর ছাব্বিশটি গান পরিবেশনে শ্রোতারা নিঃসন্দেহে আনন্দ পেয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে ইন্দ্রজিৎ বসুর তবলাও সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা আদায় করেছে। অনুষ্ঠান সূচনায় কবিতা পাঠ করেন ঃ জীবন সরকার, সুমিত রায়চৌধুরী ও আরো কয়েকজন।

দুঃখিত

কবি দুর্গাদাস সরকার কবি কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আর আমাদের মধ্যে নেই, কবি কার্তিক মিত্রও চলে গেলেন খুব অল্প বয়সে। এই সংবাদে আমরা খুব কষ্ট পেয়েছি। আমরা দুঃখিত।

কবি শংকর চট্টোপাধ্যায়

কবি শংকর চট্টোপাধ্যায় গৌহাটিতে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৯ই জুন রাত্রে পরলোকগমন করেছেন। তিনি বহু গল্প, কবিতা ও উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর একটি কাহিনী 'দিন আমাদের' চলচ্চিত্রে শীঘ্রই মুক্তি পাচ্ছে। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'কেন জন্ম কেন নির্যাতন' ১৯৭৬ সালের শ্রেষ্ঠ কবির জন্য 'ত্রিবৃত্ত পুরস্কার' পেয়েছে।

MTP Family Planning